মোগল-বিদুষী

শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

দ্বিতীয় সংস্করণ

প্রকাশক

শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

১৪, পার্শীবাগান, কলিকাতা

১৩৩১

মূল্য দশ আনা

প্রথম সংস্করণ—ফাল্গুন ১৩২৬
দ্বিতীয় সংস্করণ—চৈত্র ১৩৩১

সম্পদে-বিপদে সমসহায় সুহৃদ্বর

শ্রীযুক্ত গিরীন্দ্রশেখর বসু

করকমলেষু

সূচী

গুল্‌বদন্ ১

জেব্‌-উন্নিসা ৬৩

চিত্র

জেব্‌-উন্নিসা

সলীমগড়—রাজকারাগার

মোগল-বিদুষী

গুল্‌বদন্‌

যে-সকল পুণ্যশীলা, জ্ঞানগরিমাশালিনী মহিয়সী মহিলার নাম মোগল-ইতিহাসের পৃষ্ঠায় স্বর্ণাক্ষরে অঙ্কিত থাকিবার যোগ্য, বেগম গুল্‌বদন্‌ তাঁহাদের অন্যতমা। তিনি ভারতে মোগল-সাম্রাজ্যের স্থাপয়িতা অক্লান্তকর্ম্মী, অধ্যবসায়শীল সম্রাট্‌ বাবরের কন্যা, উত্থান-পতনের বিচিত্র লীলাস্থলী হুমায়ূনের বৈমাত্রেয় ভগিনী, এবং মোগল-কুলচন্দ্র 'দিল্লীশ্বরো বা জগদীশ্বরো বা' আখ্যার যোগ্যতম অধিকারী বাদ্‌শাহ্‌ আক্‌বরের পিতৃষ্বসা। গুল্‌বদনের সুদীর্ঘ জীবন ভূয়োদর্শনের আদর্শ; তিনি যথাক্রমে বাবর, হুমায়ূন্‌ ও আক্‌বর—মোগলের এই তিন পুরুষের অভ্যুদয়, ভাগ্যবিপর্য্যয় এবং প্রতিষ্ঠা স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়া মানব-জীবনের অপরিসীম অভিজ্ঞতা-সঞ্চয়ের সুযোগ পাইয়াছিলেন। এই অনন্যসুলভ অভিজ্ঞতার সঙ্গে তাঁহার স্বাভাবিক ধর্ম্মানুরাগ, কর্ত্তব্যনিষ্ঠা ও স্নেহমমতার অপূর্ব্ব মিশ্রণ তাঁহার জীবনকে এক অভাবনীয় বৈশিষ্ট্য দান করিয়াছে। তিনি যে 'হুমায়ূন্‌-নামা' রচনা করিয়া গিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার জীবনের অভিজ্ঞতালব্ধ বহু বিষয় স্থান পাইয়াছে। সুতরাং গুল্‌বদনের জীবনী, শুধু

ব্যক্তিগত জীবন-কথা নহে—ইতিহাস—মোগল-সাম্রাজ্যের প্রথম ও প্রধান কাহিনী।

আনুমানিক ১৫২৩ খ্রীষ্টাব্দে কাবুলে গুল্‌বদনের জন্ম হয়। তাঁহার পিতা বাবর তখন কাবুলের একজন ক্ষুদ্র অধিপতি। কিন্তু মহামনা বাবর ঐ ক্ষুদ্ররাজ্যের ক্ষুদ্র বাদশাহীতে সন্তুষ্ট ছিলেন না। যে দিগ্‌দিগন্তবিস্তৃত রাজ্য, অতুল ঐশ্বর্য্যের অক্ষয় ভাণ্ডার, স্বর্ণভূমি হিন্দুস্থান একদিন তাঁহারই ষষ্ঠতম পূর্ব্বপুরুষ তৈমূরের দুর্দ্দান্ত প্রতাপের নিকট আত্মসমর্পণ করিয়াছিল, বীর্য্যবান্ বাবর সেই অপূর্ব্ব বিশাল রাজ্যটি করতলগত করিবার কল্পনায় বিভোর ছিলেন। শুধু কল্পনার বিভোর ছিলেন বলিলে ভুল হইবে, কেন না কন্যার জন্মকালে তিনি কার্য্যক্ষেত্রে বহুদূর অগ্রসর—বারবার বিফলপ্রযত্ন বাবর হিন্দুস্থান-বিজয়ের চেষ্টায় ব্যাপৃত। তারপর গুলের বয়ঃক্রম যখন দুই বৎসর, তখন তিনি পরিবারবর্গকে কাবুলে রাখিয়া হিন্দুস্থানে অভিযান করিয়াছেন। এই অভিযানই অবশেষে তাঁহাকে বিজয়-মাল্যে বিভূষিত করিয়া হিন্দুস্থানের অভিলষিত অধিপতি-পদে বরণ এবং কাবুলের চিন্তিত ও উৎকণ্ঠিত পরিজনগণকে অভূতপূর্ব্ব আনন্দে নিমগ্ন করিয়াছিল।

এইস্থানে বাবরের মহিষীবৃন্দের একটু সংক্ষিপ্ত ইতিহাসের অবতারণা বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। তখন বেগমগণের মধ্যে দিল্‌দার, মাহম্, গুল্‌রুখ্ এবং মুবারিকা, এই চারিটি বর্ত্তমান। দিল্‌দার বেগমের পাঁচ সন্তান;—গুল্‌রং নামে কন্যা

সর্ব্বজ্যেষ্ঠা, তারপর গুল্‌চিহ্‌রা, তৎপরে পুত্র আবূ-নাসির—ইতিহাসে যিনি হিন্দাল্‌ নামে প্রসিদ্ধ, আবু-নাসিরের পরেই গুল্‌বদন্‌, গুলের পরে আল্‌ওয়ার নামে এক পুত্র।

মাহম্‌কে বাবরের পাটরাণী বলা যাইতে পারে। তাঁহার গর্ভেই বাদ্‌শাহের জ্যেষ্ঠপুত্র—সাম্রাজ্যের উত্তরাধিকারী হুমায়ূনের জন্ম। সম্রাটের হৃদয়-রাজ্যে এবং পৌরজনমধ্যে মাহমের অসীম প্রভাব-প্রতিপত্তির পরিচয় পাওয়া যায়। কিন্তু এই পতি-সোহাগিনীর জীবনে একটি বড় ক্ষোভের কারণ ঘটিয়াছিল। তাঁহার যতগুলি সন্তান জন্মে, একমাত্র হুমায়ূন ব্যতীত একটিও জীবিত ছিল না—একে একে সবগুলিই শৈশবে মৃত্যুমুখে পতিত হয়। গুল্‌বদন্‌ যখন সবে দুই বৎসরের বালিকা, তখন মাহম্‌ তাহাকে কন্যারূপে গ্রহণ করেন। ইতিপূর্ব্বেই মাহম্‌কে চারিটি সন্তানের বিয়োগ-বেদনা সহ্য করিতে হইয়াছিল। সন্তান-বিয়োগ-বিধুরা জননী স্নেহের ক্ষুধা মিটাইবার জন্যই হউক, অথবা নিজ শিশু-সন্তানের অভাবে দিল্‌দারের গর্ভজাত কন্যাকে পরমস্নেহে প্রতিপালন করিয়া স্বামীর তৃপ্তিসাধনের জন্যই হউক, গুল্‌কে আপনার অঙ্কে তুলিয়া লইয়া থাকিবেন। কিন্তু ইহাই শেষ নহে, দিলের অন্যতম পুত্র হিন্দাল্‌ যখন চারিদিনের শিশু, তখন তাহাকেও তিনি দত্তকরূপে গ্রহণ করেন। মহিষী দিল্‌দারের যে ইহাতে আপত্তি ছিল না, এমন নহে—আপত্তি যথেষ্টই ছিল। কিন্তু তিনি নিরুপায়;—মাহমের হস্তে গৃহের সর্ব্বময় প্রভুত্ব, তাহার উপর স্বামীর অভিপ্রায়;

সকল দিক্ বিবেচনা করিয়া অনিচ্ছাসত্ত্বেও সন্তানদ্বয়কে তাঁহার অঙ্কচ্যুত করিতে হইয়াছিল।

মহিষী গুল্‌রুখের গর্ভে কামরান্, অস্করী, শাহ্‌রুখ্, সুল্‌তান্ আহ্‌মদ্ ও গুল্-ইজার বেগম, এই পাঁচটি সন্তান।

বিবি মুবারিকা, ইউসুফ্‌জাই-প্রধানের কন্যা। এই পার্ব্বত্য প্রধান বাবরের আনুগত্য স্বীকার করিয়া তাহারই নিদর্শনস্বরূপ বাবরকে তাঁহার এই রূপলাবণ্যময়ী কন্যারত্ন দান করেন। ইঁহার কোনও সন্তানসন্ততি জন্মে নাই।

বাবরের স্বজনগণ যখন অত্যন্ত চিন্তাকুলচিত্তে কাবুলে অবস্থান করিতেছিলেন, অমিততেজা, নির্ভীক, স্থিরধী বাবর তখন হিন্দুস্থানে ঘোর সমরে নিযুক্ত। কিন্তু এই পুরুষসিংহের প্রতি ভাগ্যলক্ষ্মী অসম্ভব প্রসন্ন হইয়া উঠিয়াছিলেন। জয়, জয়, জয়—জয়ের পর জয়! পানিপথ, খানুয়া, ঘাগ্‌রা—একে একে এই তিন মহাসমরে বিজয়ী হইয়া তিনি হিন্দুস্থানের ভাগ্যবিধাতৃপদে অধিষ্ঠিত হইলেন। এতদিনে অনেকটা নিশ্চিন্ত হইবার পর প্রিয়পরিজনের কথা বিশেষ করিয়া তাঁহার মনে উদিত হইল; তিনি তাঁহাদিগকে হিন্দুস্থানে আসিতে লিখিলেন। কিন্তু তখন কাবুল হইতে হিন্দুস্থানে আসিবার পথ এখনকার ন্যায় সুগম ছিল না;—পথ সুদীর্ঘ, পাহাড়-পর্ব্বত এবং মরুকণ্টকিত। তাহার উপর নানা কারণে বাবরের আত্মীয়স্বজনগণের কাবুল পরিত্যাগ করিতে একটু বিলম্ব হইল। সুতরাং শুভসম্মিলন আর কোনক্রমেই যথাসময়ে ঘটিয়া উঠিল না। পরিজনগণের মধ্যে

বাবরের প্রিয়তমা মহিষী মাহম্‌ই সকলের অগ্রবর্ত্তিনী হইয়াছিলেন ; তিনি আর-সকলকে পশ্চাতে রাখিয়া যথাসম্ভব দ্রুতগতি স্বামি-সন্দর্শনে আগমন করেন। বলা বাহুল্য মাহম্‌, গুল্‌বদন্‌কে সঙ্গে আনিতে ভুলেন নাই। বাবর ইঁহাদের যথারীতি সম্বর্দ্ধনা করিয়া আনিবার জন্য পূর্ব্বেই ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। আলিগড়ের নিকট বাদশাহের লোকজনের সহিত মাহমের সাক্ষাৎ হয়। অতঃপর তিনি যখন আগ্রায় পৌঁছেন (২৭শে জুন, ১৫২৯), তখন রাত্রি হইয়া গিয়াছে। গভীর রাত্রেই প্রাণাধিকা পত্নীর সহিত বাবরের শুভসম্মিলন ঘটিল। কিন্তু চারি বৎসর পূর্ব্বে যে নয়নানন্দ স্নেহের পুত্তলীকে সুদূর কাবুলে দেখিয়া আসেন, তাহার অদর্শনে বাদ্‌শাহ্‌ অধীর হইয়া উঠিলেন। মাহম্‌ রাত্রি হইবে বলিয়া আগ্রা আসিবার পথে গুল্‌কে আলিগড়েই রাখিয়া আসিয়াছিলেন। যাহা হউক, পরদিন প্রভাতে পিতা ও পুত্রীর সাক্ষাৎ হইল। পূর্ব্বে যখন গুল্‌ পিতাকে দেখিয়াছিল, তখন তাহার বয়স সবে দুই—সে জ্ঞানহীনা বালিকা মাত্র। পিতার সম্বন্ধে তাহার কোন ধারণা থাকিলে তাহা অতীব ক্ষীণ, অস্পষ্ট হইবারই কথা। এরূপ অপরিচিত-তুল্য পিতার কাছে শিশু-কন্যার পদে পদে একটা সসঙ্কোচ ভয়ের বাধা স্বভাবতঃই উপস্থিত হইয়া থাকে। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয়, গুলের সেরূপ কিছুই হয় নাই। দর্শনমাত্র কন্যা পিতৃচরণে লুটাইয়া পড়িল। সন্তানবৎসল পিতা, পরমস্নেহে তাহাকে বক্ষে ধারণ করিয়া প্রশ্নের পর প্রশ্নে অস্থির করিয়া তুলিলেন। গুল্‌বদন্‌ স্বরচিত 'হুমায়ূন্‌-নামায়' লিখিয়াছেন,—

'পিতার স্নেহপাশে আবদ্ধ হইয়া আমি তখন যে বিমল আনন্দের আস্বাদ পাইয়াছিলাম, জীবনে তদপেক্ষা অধিক আনন্দের কল্পনা করা অসম্ভব।'

সম্রাট্ তাহার পর কিছুদিন মাহম্ ও গুল্‌কে লইয়া আগ্রায় কাটাইলেন। দিনগুলি যে অতীব শান্তি-সুখে অতিবাহিত হইয়াছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু অধিক দিন একস্থানে বাস করা, চিরসঞ্চরণশীল, চঞ্চলপ্রকৃতি সম্রাটের স্বভাববিরুদ্ধ; বিশেষ সেকালের আগ্রার আশপাশের দৃশ্য তাঁহার নিকট নিরতিশয় অপ্রীতিকর বোধ হইত। সৌন্দর্য্য ও মাধুর্য্যের উপাসক সম্রাট্ ঢোলপুর ও সীক্‌রীকে মনের মত করিয়া সাজাইয়া তুলিতেছিলেন। তিনি মাহম্ ও গুল্‌কে লইয়া ঐ দুইস্থান দেখিতে গেলেন।

সীক্‌রীর উদ্যান-বাটিকার একাংশে বসিয়া বাবর আত্মকাহিনী 'তুজুক্' রচনা করিতেন। এইস্থানে একদিন একটি দুর্ঘটনা ঘটিল। মাহম্ ভগবদুপাসনায় রত; ভবনের সম্মুখে'গুল্ বিমাতা মুবারিকার নিকট অবস্থিত। হঠাৎ শিশুসুলভ, ক্রীড়াচঞ্চল গুল্ বিমাতাকে করাকর্ষণ করিবার জন্য পুনঃ পুনঃ অনুরোধ করিতে লাগিল। কিছুতেই প্রতিনিবৃত্ত না হওয়ায় মুবারিকাকে কন্যার আবদার রক্ষা করিতে হইল। কিন্তু পার্ব্বত্যনন্দিনী মুবারিকার আকর্ষণ যতই মৃদু, যতই কোমল হউক না কেন, তাহা গুলের কোমল বাহুলতার পক্ষে বিষম হইয়াছিল। একখানি অস্থি স্থানচ্যুত হওয়ায় বালিকা চীৎকার করিয়া উঠিল। সুখের বিষয়, অবিলম্বে চিকিৎসার ব্যবস্থা হওয়ায় ব্যাপার গুরুতর

হইতে পারে নাই ;—গুল্‌ ধীরে ধীরে সুস্থ হইয়া উঠে। এই ঘটনার পর বাবর আর তিলার্দ্ধও সীকৃরীতে অবস্থান করেন নাই।

আগ্রায় পৌঁছিয়াই সম্রাট্‌ শুনিলেন, অবশিষ্ট পরিজনগণ এতদিনে কাবুল হইতে আসিতেছেন। তিনি স্বয়ং অনেকটা পথ অগ্রসর হইয়া পরম শ্রদ্ধেয়া জ্যেষ্ঠা ভগিনী খান্‌জাদা বেগম ও অন্যান্য সকলকে যথাযোগ্য সম্মান ও সমাদরের সহিত অভ্যর্থনা করিলেন।

কিন্তু শেষের দিন ঘনাইয়া আসিয়াছিল। বাদ্‌শাহ্‌ বাবরের চরম আকাঙ্ক্ষা—হিন্দুস্থান-বিজয় শেষ, প্রিয় আত্মীয়বর্গ নিকটে, —প্রাণাধিক পুত্র হুমায়ূন্‌ রাজ্যভারগ্রহণের উপযুক্ত। বিদায়—এইবার বিদায়! বাদ্‌শাহের নয়নে কোন্‌ এক অজানা দেশের রশ্মিপাত হইয়াছে কে বলিবে? একদিন তিনি পরিজনবর্গসহ বাঘ্‌-ই-জার্‌-আফশান্‌ উদ্যানে উপস্থিত হইয়া প্রার্থনার পূর্ব্বে 'ওজু' করিবার স্থান দেখিতে দেখিতে বলিলেন,—'রাজত্ব ও রাজ্যশাসন-রশ্মি আকর্ষণ করিয়া আমার হৃদয় অবসন্ন। এইবার এই উদ্যানেই আমি চিরবিশ্রামলাভ করিব।'

বাদ্‌শাহের বয়স আটচল্লিশ বৎসর; মধ্য-এশিয়া-সম্ভূত কঠোর-শ্রমী এই বীরবরের পক্ষে বার্দ্ধক্যের বহু বিলম্ব; পদতলে নববিজিত ধনধান্যপূর্ণ, সুবিপুল স্বর্ণভূমি ভারত। কিন্তু তাঁহার মুখে এখনই বিদায়ের এ কি বিষাদময়ী বাণী! পতিপ্রাণা মহিষী মাহম্‌ ও অন্যান্য বেগমেরা অশ্রুসংবরণ করিতে পারিলেন না। মাহম্‌

তৎক্ষণাৎ খোদার আশীর্ব্বাদ মাগিয়া আশাপূর্ণ মধুর বাক্যে, স্বামীকে শান্তি ও সান্ত্বনা দিলেন।

কিন্তু বাদ্‌শাহের শেষের দিন সত্যসত্যই সমীপবর্ত্তী হইয়াছিল। তিনি আনন্দের অবিশ্রান্ত কলরোলের মধ্যে থাকিয়াও কেমন করিয়া যে নিঃশব্দ-পদসঞ্চারী মৃত্যুর আসন্ন আগমনের আভাস পাইয়াছিলেন, তাহা বলা দুরূহ। যদিও কঠোর কার্য্য, সংগ্রাম-সঙ্ঘর্ষ তাঁহার স্বাস্থ্যের অন্তরায়স্বরূপ হইয়াছিল, তথাপি স্বাস্থ্যভঙ্গ হইবার মত কোন লক্ষণ তাঁহার দেহে প্রকাশ পায় নাই। তিনি স্থান হইতে স্থানান্তরে পরিভ্রমণ এবং আরব্ধ-কার্য্য পরিদর্শনাদি করিয়া সময়ের সদ্ব্যবহার করিতেছিলেন। তাহার পর তাঁহার মৃত্যুর যে বিবরণ ইতিহাসে লিপিবদ্ধ আছে, তাহাকে কোনক্রমেই স্বাস্থ্যহানি-ঘটিত মৃত্যু বলা যাইতে পারে না,—তাহা বাবরের অপূর্ব্ব আত্মবিসর্জ্জন বা ইচ্ছামৃত্যু!

যাহা হউক, শেষের দিনগুলি সম্রাটের পক্ষে বড় শান্তিপ্রদ হইতে পারে নাই। একদিন বাদ্‌শাহ্-পরিবারে শোকের এক মর্ম্মভেদী হাহাকার ধ্বনি উঠিল। পুত্র আল্‌ওয়ার মীর্জ্জা সম্রাটের স্নেহপূর্ণ কোমল হৃদয়ে শেল হানিয়া অকালে ইহসংসার হইতে অপসৃত হইল। শোকাবেগ কথঞ্চিৎ প্রশমিত হইতে না হইতেই সংবাদ আসিল, সম্রাটের প্রাণাধিক জ্যেষ্ঠপুত্র, সিংহাসনের ভাবী উত্তরাধিকারী, হুমায়ূন্ মীর্জ্জা অসুস্থ—অবস্থা অত্যন্ত সঙ্কটজনক। উদ্বেগাকুলচিত্তে ত্বরায় বাদ্‌শাহ্ ও মাহম্ মথুরা পৌঁছিয়া পীড়িত পুত্রকে সঙ্গে লইয়া আগ্রা ফিরিলেন।

হুমায়ূন্‌ তখন অতি ক্ষীণ, জীবনী-শক্তিহীন ; ঘোর অচেতন অবস্থা হইতে মাঝে মাঝে চেতনার কূলে উত্তীর্ণ হইতেছেন বটে, কিন্তু সে মুহূর্ত্তের জন্য। জীবনের কোন আশা নাই বলিয়া চিকিৎসকগণ মত প্রকাশ করিয়াছেন। পুত্রের অবস্থা দেখিয়া করুণারূপিনী মাহমের স্নেহার্দ্র কোমল হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যাইতেছিল। কিন্তু বাদ্‌শাহের বিহ্বলতা দেখিয়া তাঁহাকে আত্মসংবরণ করিতে হইল। সম্রাট্‌কে সান্ত্বনা দিবার জন্য বলিলেন,—'জাঁহাপনা, আপনি কেন আমার পুত্রের জন্য আকুল হইতেছেন ? আপনি বাদ্‌শাহ্‌, আপনার আরও কত পুত্র ; তাহাদের মুখ চাহিয়া হৃদয়কে শান্ত করুন। আমি যে কাতর হইতেছি, তাহার কারণ, আমার সবে এক পুত্র—এই হুমায়ূন্‌।'

বাবর বলিলেন,—'মহিষী, তুমি যাহা বলিতেছ, সব সত্য —আমার আরও পুত্র আছে ; কিন্তু তোমার গর্ভজাত এই পুত্রটিকে আমি যত ভালবাসি, এত ভাল, আমি আর কাহাকেও বাসি না। মুমূর্ষু হুমায়ূন্‌ নীরোগ, সুখী, দীর্ঘজীবী হয়, ইহাই আমার প্রার্থনা ; আর পুত্রগণের মধ্যে একমাত্র সে-ই আমার সাম্রাজ্যের অধিকারী হয়, ইহাই আমার কামনা ; কেন না আমি আর কাহাকেও তাহার সমকক্ষ মনে করি না।'

বাদ্‌শাহ্‌ কোনক্রমেই সান্ত্বনালাভ করিতে পারিলেন না। মৃত্যুর করালছায়াঙ্কিত পুত্রের পাণ্ডুর মুখচ্ছবি নিরীক্ষণ করিতে করিতে তিনি যখন দিশাহারা হইয়া পড়িয়াছেন, তখন একটি কথা শুনিয়া তিনি যেন অন্ধকার অকূল-পাথারে আশার আলো

দেখিতে পাইলেন। কথাটি এই—'হুমায়ূনের যে অবস্থা, তাহাতে একমাত্র ভগবদনুগ্রহ ব্যতীত তাহার রক্ষার আর উপায় নাই। শ্রেষ্ঠ অর্ঘ্যদানে ভগবানের প্রসন্নতা লাভ করা আবশ্যক।' ধর্ম্মপ্রাণ, সরল-বিশ্বাসী বাদ্‌শাহ্‌ তৎক্ষণাৎ সঙ্কল্প করিলেন, জীবনের তুল্য শ্রেষ্ঠ অর্ঘ্য জগতে আর কিছুই নাই,—তিনি আত্মজীবন-বিনিময়ে পুত্রের প্রাণরক্ষা করিবেন। ইহাতে বাদ্‌শাহের অন্তরঙ্গ হিতৈষিগণের ঘোরতর আপত্তি হইবে, তাহা বলাই বাহুল্য। তাঁহারা বলিলেন,—'জঁাহাপনা, ধনরত্ন মানসিক করুন, না হয় ধনভাণ্ডার, কিংবা মণির সেরা যে কোহিনূর, পুত্রের জন্য তাহাই উৎসর্গ করুন—আপনার জীবন দান করিবেন না।' বাবর শাহ্‌ অচল অটল, কোন কথাই তাঁহার কর্ণে প্রবেশ করিল না। তিনি দৃঢ়কণ্ঠে বলিলেন,—'আমার পুত্রের জীবনের সঙ্গে তুলিত হইতে পারে, দুনিয়ায় কি এমন কোন মণি আছে?' ইহার আর উত্তর নাই। উপস্থিত সকলে নীরব।

বাবর ধীরে ধীরে হুমায়ূনের শয়নকক্ষে প্রবেশ করিয়া, তাহার শিরোদেশে একটিবার স্থির হইয়া দাঁড়াইলেন। তাহার পর গম্ভীরমুখে শয্যা প্রদক্ষিণ করিতে করিতে একান্ত মনে প্রার্থনা করিতে লাগিলেন,—'মেহেরবান্‌ খোদা, যদি জীবন দিলে জীবন মিলে, তাহা হইলে আমি বাবর শাহ্‌, পুত্র হুমায়ূনের জন্য আমি আমার জীবন, আমার সত্তা অর্পণ করিলাম।'

বাবর সফলকাম হইয়াছিলেন; তৎক্ষণাৎ চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিলেন,—'কৃতকার্য্য হইয়াছি, আমি কৃতকার্য্য হইয়াছি।

পুত্রের ব্যাধি আমি নিজ দেহে গ্রহণ করিতে সমর্থ হইয়াছি!' ক্রমে সুস্থকায় বাদ্‌শাহ্ ব্যাধিগ্রস্ত এবং তাঁহার মরণাহত নিজ্জীব পুত্র সঞ্জীবিত ও সুস্থ হইলেন।

তারপর রাজ্যের প্রধান প্রধান ব্যক্তিগণ আহূত হইয়া সম্রাটের সম্মুখে উপস্থিত হইলে, তিনি যুবরাজ হুমায়ূন্‌কে তাহাদের হস্তে অর্পণ ও রাজ্যের উত্তরাধিকারী বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া সানন্দে সন্তুষ্টচিত্তে চিরশান্তিময় অমরলোকে প্রস্থান করিলেন (২৬শে ডিসেম্বর, ১৫৩০)। অতৃপ্ত রহিল,—সম্রাটের কীর্ত্তিসূচিত, বিশাল ভারতের রাজ্যভোগ-বাসনা; পড়িয়া রহিল—শোকস্মৃতি-সমাচ্ছন্ন প্রাণপ্রতিমা প্রেয়সী মাহম্, বিচ্ছেদকাতর রোরুদ্যমান্ সন্তান-সন্ততি ও আত্মীয়স্বজন।

বাবরের পরলোকগমনের পর হুমায়ূন্ যখন ভারতের রাজ-তক্তের অধিকারী হইলেন, তখন তাঁহার বয়স ২২ বৎসর। ইতিপূর্ব্বে এদেশের অভিনব শান্তিসুখকর আব্‌হাওয়া তাঁহার তরল স্বভাবের উপর অপরিসীম প্রভাব বিস্তার করিতে আরম্ভ করিয়াছিল;—তিনি বিলাসী, আলস্যপরতন্ত্র ও অহিফেনসেবী হইয়াছিলেন। প্রবীণ, চিরসতর্ক, মহাবল বাবরের শৌর্য্য-বীর্য্য ও শাসনের নিকট যে-সকল শত্রু এতদিন অবনতশির ছিল, এই তরুণ সম্রাটের শিথিল-শাসনের সুযোগে তাহারা আবার মহোৎসাহে মস্তকোত্তলন করিল। রাজপরিবারেও ঘোর অশান্তির

অনল জ্বলিয়া উঠিল। বৈমাত্রেয় ভ্রাতা কামরান্ পঞ্জাব, কাবুল, কন্দাহার ও ঘাজ্‌নী প্রদেশের অধিকার পাইয়াও সন্তুষ্ট হইতে পারিলেন না,—ভ্রাতার সিংহাসনের প্রতি লোলুপ ঈর্ষাদিগ্ধ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। ফলে হুমায়ূনের রাজ্যলাভ তাঁহার সুখের হেতু না হইয়া অশান্তি ও বিড়ম্বনায় পর্য্যবসিত হইল। বস্তুতঃ, সিংহাসনারোহণকাল হইতে আরম্ভ করিয়া হুমায়ূনের পরবর্ত্তী জীবনের ইতিহাস—বিপ্লব, বিদ্রোহ, দুর্ঘটনা ও ভাগ্য-বিপর্য্যয়ের শোচনীয় পুঞ্জীভূত ঘটনায় পরিপূর্ণ। এই সকল দুর্নিমিত্ত দুর্দ্দৈবের দ্রুততর পটক্ষেপণের মধ্যে স্নিগ্ধমধুর, চিত্তবিমোহন গুল্‌বদন্-চরিত্রের সান্নিধ্য লাভের সুযোগ বড়-একটা ঘটিয়া উঠে না। কদাচিৎ কখনও যে ঘটনাসূত্রে বিদ্যুৎ চমকের ন্যায় তাঁহার দর্শন এবং পরমুহূর্ত্তেই অদর্শন ঘটে, তখনকার সেই ক্ষণিক চিত্র পাঠকগণের সম্মুখে প্রতিফলিত করিবার জন্যই হুমায়ূনের বিধিবিড়ম্বিত, বিঘ্নবহুল জীবনের ঘটনাপরম্পরার কিঞ্চিৎ ইতিহাস বিবৃত করিতে হইবে।

বাবরের মৃত্যুর পরেও মহিষী মাহম্ কিছুকাল তাঁহার মৃতকল্প জীবন লইয়া কোনরূপে সংসার-অরণ্যে বিচরণ করেন। রাজ্যের নানাস্থানে বিদ্রোহ ও অশান্তির সূচনা তাঁহাকে প্রত্যক্ষ করিতে হইয়াছিল সন্দেহ নাই; কিন্তু বীরবর বাবরের ভুজবলে জিত ও শাসিত রাজ্যের, এবং প্রাণাধিক পুত্র হুমায়ূনের তেমন কোনও গুরুতর অমঙ্গল সংঘটিত হইবার পূর্ব্বেই, পতিপ্রাণা সাধ্বী স্বামীর অনুসন্ধানে অদৃশ্যলোকে প্রয়াণ করিলেন (৮ই মে, ১৫৩৩)।

সুতরাং দুর্দ্দৈবের যে দুঃসহ কোপ অতঃপর বাদ্‌শাহ্‌-পরিবারকে ছিন্নভিন্ন করিয়া দুঃখের অতলতলে নিক্ষেপ করিয়াছিল, তাহা তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে নাই।

করুণারূপিণী মাহমের অভাবে বাদ্‌শাহ্‌-পরিবার শোকের গভীর অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন হইল। মহিষী, স্বামি-বিচ্ছেদের অসহ্য বেদনা নীরবে বহন করিয়া, স্নেহপীযূষদানে এতদিন সন্তানগণের পিতৃশোক ভুলাইয়া রাখিয়াছিলেন। তাহারা যেন মাহমের মাতৃরূপের মধ্যেই তাহাদের পিতার সন্ধান পাইত। পাছে বাবরের সন্তানগণ কোন প্রকারে মর্ম্মপীড়া বোধ করে, পাছে কোন আচরণে মহামান্য বাবরের সম্মান ও মর্য্যাদাহানি হয়, এই ভয়েই তিনি তটস্থ ছিলেন। তাঁহার মৃত্যুতে সন্তান-সন্ততিগণের মধ্যে শুধু যে মাতৃশোকের প্রবাহ বহিয়াছিল, তাহা নহে,—পিতৃশোকও উদ্বেলিত হইয়া উঠিয়াছিল। গুল্‌বদন্‌ লিখিয়াছেন,—'তখন আমি যেন এই সংসার-অরণ্যে আপনাকে নিতান্ত নিঃসঙ্গ ও নিরাশ্রয় বোধ করিলাম। আমি দিবারাত্র তাঁহার জন্য শোক করিয়াছি, কত কাঁদিয়াছি, দুঃখে হাহাকার করিয়াছি। যখন আমি দুই বৎসরের শিশু, তখন আকাম্‌ (মাহম্‌) আমাকে কন্যারূপে গ্রহণ করেন, আর ১০ বছর বয়সের সময় তিনি আমাকে পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন। এতদিন তিনি আমাকে পরম স্নেহে পালন করিয়াছিলেন।'

যে সময়ে মানুষের জ্ঞানের উন্মেষ হয়, মানুষ মানুষকে আপনার বলিয়া জানিতে চিনিতে আরম্ভ করে, গুল্‌ জীবনের সেই সোণার

ঊষায় মাহম্‌কে জননী বলিয়া অভিনন্দন করিয়াছিল। সুতরাং পিতার পরলোকের পর, মাহমের বিয়োগ তাহার কোমলকরুণ চিত্তে কিরূপ গভীর বেদনার সঞ্চার করিয়াছিল, তাহা সহজেই অনুমেয়।

কিছুদিন পরেই গুল্‌বদন্‌ ও হিন্দাল্‌—দুই ভাই ভগিনী, তাহাদের গর্ভধারিণী জননী দিল্‌দারের আশ্রয়ে গমন করেন। জননী দিল্‌দার যে উভয়কে পরমস্নেহে বক্ষে তুলিয়া লইয়াছিলেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু গুল্—স্নেহগুণমুগ্ধা কৃতজ্ঞহৃদয়া গুল্—যাহাকে তিনি আট বৎসর পূর্ব্বে শিশু অবস্থায় অঙ্কচ্যুত করিয়াছিলেন,—তাঁহার একান্ত আপনার সেই শিশু গুল্—আজ কৈশোরের সীমান্তে পদার্পণ করিতে চলিয়াছে। মাহমের সংসারের আদর-যত্ন পাইয়া, তাঁহারই হৃদয়ের স্নেহরস আকর্ষণ করিয়াই কি আজ সে এত বড়টি হয় নাই? তাঁহাদের কথা সে কেমন করিয়া বিস্মৃত হইবে? এখন দিল্‌দার একাই তাহার জননী নহেন;—জননী তাহার দ্বিধা-বিভক্ত,—এক দিল্‌দার, অপর মাহম্‌। মাহমের স্নেহের বেদনাতুর স্মৃতি, আর সেখানে সে যে ভাই হুমায়ূন্‌কে পাইয়াছে—যাঁহার সঙ্গে তাহার আনন্দের, সহানুভূতির মধুর সম্পর্ক, তাঁহার কথা কত গভীরভাবে গুলের হৃদয়ে মুদ্রিত!

গুলের মনে পড়ে, পিতার মৃত্যুর অনতিপূর্ব্বে ভ্রাতা হুমায়ূন্‌ যখন দুরারোগ্য কঠিন রোগে শয্যাগত, অসহনীয় যন্ত্রণায় মুহুর্মুহু বিলুপ্তচেতন, সেই নিদারুণ মুহূর্ত্তেও গুল্‌কে দেখিয়া তিনি কত স্বস্তি অনুভব করিয়াছিলেন; তাহাকে বক্ষদেশে ধারণ করিতে

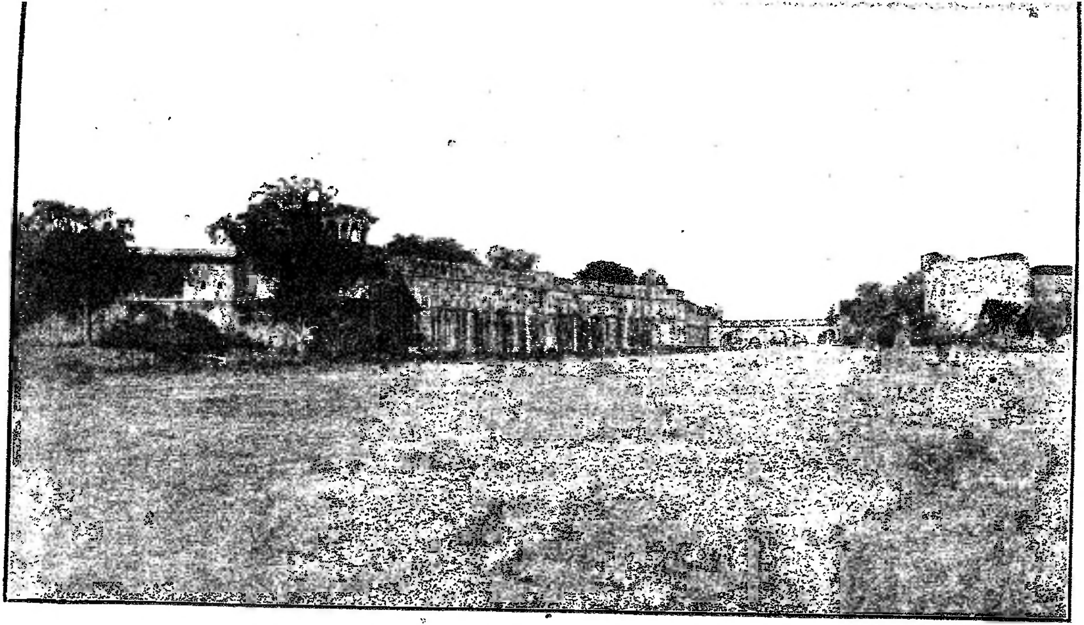

সলীমগড়—রাজকারাগার

না পারিয়া কত দুঃখ করিয়াছিলেন। তারপর পিতার মৃত্যু হইল; ক্রমে মাতা মাহম্‌ও সংসার-রঙ্গমঞ্চ হইতে চিরবিদায় গ্রহণ করিলেন। ভ্রাতা ও ভগিনী উভয়েই শোকে মুহ্যমান হইয়াছিলেন সন্দেহ নাই। কিন্তু হুমায়ূন্‌ গুল্‌কে সান্ত্বনা দিবার জন্য যেন নিজের শোকও বিস্মৃত হইলেন। এত স্নেহ, এত সহানুভূতি কি এ সংসারে সত্যসত্যই দুর্ল্লভ নহে? সুতরাং হুমায়ূন্‌ বৈমাত্রেয় ভ্রাতা হইয়াও যে গুলের নিকট সহোদর অপেক্ষা প্রিয়তর হইবেন, আশ্চর্য্য কি?

যাহা হউক, মাহম্‌ সংসারপাশ হইতে মুক্ত হইয়া বাঁচিলেন। রাজ্যের চতুর্দ্দিকে এতদিন যে বিদ্রোহের বহ্নি ধূমায়িত হইতেছিল, তাহা দেখিতে দেখিতে করাল লেলিহান রসনা বিস্তার করিয়া বাদ্‌শাহ্‌-পরিবারকে গ্রাস করিতে উদ্যত হইল।

প্রধানতঃ পাঠানগণকে নিপীড়িত ও পরাজিত করিয়াই মোগল-কুলগৌরব বাবর হিন্দুস্থানে মোগল-রাজত্বের ভিত্তি স্থাপন করেন। সুতরাং বিজিত পাঠানেরা যে মোগলের পরম শত্রুরূপে উপযুক্ত সুযোগের প্রতীক্ষায় দিন গণিতে থাকিবে, তাহার আর বৈচিত্র্য কি? হুমায়ূনের শাসন-শৈথিল্য অচিরে তাহাদের সেই অভিলষিত সুযোগ উপস্থিত করিল।

পূর্ব্বাঞ্চলে মগধে মহাশক্তিধর চতুরচূড়ামণি শের খাঁ বিক্ষিপ্ত পাঠানগণকে কেন্দ্রীভূত করিয়া আবার ভাগ্যপরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হইলেন। তিনি পূর্ব্বেই চুনারের দুর্গ হস্তগত করিয়া বিহারের অধিকার দৃঢ়তর করিয়া তুলিয়াছিলেন। শেরের উত্তরোত্তর

ক্ষমতা-মদমত্ততার পরিচয় পাইয়া হুমায়ূন্ নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিলেন না ;—সসৈন্য তাঁহার বিরুদ্ধে অভিযান করিলেন। চুনার-দুর্গই তখন শেরের শৌর্য্যপ্রকাশের প্রধান অবলম্বন। বাদ্‌শাহী-বাহিনী সর্ব্বাগ্রে এই কেল্লাটি অবরোধ করিয়া বসিল। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয়, এই অবরোধ শেরের তেমন কোন ক্ষতি বা অনিষ্টের কারণ না হইয়া বরং বিশেষ ইষ্টের কারণই হইয়াছিল। হুমায়ূনের সেনাদল যখন চুনার-অবরোধে ব্যাপৃত, তখন শের খাঁ কৌশলে রোহ্‌তাসের সুদৃঢ় গিরিদুর্গ দখল করিয়া বসিলেন, আর তাঁহার দুর্দ্দান্ত সেনাদল মহা উল্লাসে বাঙ্গালার রাজধানী গৌড়ের ধনসম্পদ্ লুঠিতে লাগিল।

চুনার-দুর্গ করগত করিয়া হুমায়ূন্ গৌড়াভিমুখে অগ্রসর হইলেন বটে, কিন্তু তাঁহার পৌঁছিবার পূর্ব্বেই শের গৌড়ের লুণ্ঠিত ধনরত্নাদি নিরাপদে ও নির্ব্বিঘ্নে রোহ্‌তাস্-দুর্গে স্থানান্তরিত করিলেন। হুমায়ূন্ গৌড়ে প্রবেশ করিয়া সেখানকার শোভা-সৌন্দর্য্যের মোহে এমনই আকৃষ্ট হইয়াছিলেন যে, তথা হইতে আর শীঘ্র তাঁহার নির্গমনের সম্ভাবনা রহিল না। বিলাসপ্রিয় বাদ্‌শাহের প্রমোদময় দিনগুলি যে কোথা দিয়া কেমন করিয়া অতিবাহিত হইতে লাগিল, তাহা যেন তাঁহার উপলব্ধ হইল না। দুঃখের বিষয়, কিছুকাল এইরূপে অতিবাহিত হইবার পর রাজধানীতে এক বিভ্রাটের সূচনা হইল। হুমায়ূনের শিথিল স্বভাব সম্বন্ধে ইতিমধ্যে অনেক কথাই চারিদিকে প্রচারিত হইয়া পড়িয়াছিল। তাঁহার প্রতি অসন্তুষ্ট কতিপয় আমীর তাঁহার

বৈমাত্রেয় ভ্রাতা হিন্দাল্‌কে সিংহাসনে বসাইবার আয়োজন করিতে লাগিলেন। হিন্দাল্‌ বিদ্রোহী হইলেন। সংবাদ পাইবামাত্র হুমায়ূনের সুখনিদ্রা চকিতে ভাঙ্গিয়া গেল,—তিনি অবিলম্বে আগ্রা যাত্রা করিলেন।

কিন্তু উদ্যোগী পুরুষসিংহ শের খাঁও এদিকে নিশ্চিন্ত ছিলেন না। হুমায়ূনের প্রত্যাগমন-পথে তাঁহার সহিত যথোপযুক্ত রণসম্ভাষণের আশায় শক্তিসঞ্চয়পূর্ব্বক অপেক্ষা করিতেছিলেন। এক্ষণে বাদ্‌শাহী-বাহিনীকে অগ্রসর হইতে দেখিয়া বক্‌সার ও চৌসার নিকট তাঁহাদের গতিরোধ করিয়া দণ্ডায়মান হইলেন। শোন পার হইয়াই হুমায়ূন্‌কে প্রমাদ গণিতে হইল। উপায়ান্তর না দেখিয়া তিনি সন্ধির প্রস্তাব করিয়া পাঠাইলেন। সন্ধির সর্ত্ত লইয়া কয়েক দিন অতিবাহিত হইল। ইতিমধ্যে একদিন রাত্রিশেষে শের অতর্কিতভাবে মোগল-শিবির আক্রমণ করিলেন। এই আক্রমণে অপ্রস্তুত মোগল-বাহিনীর দুর্দ্দশার অন্ত রহিল না;—তাহারা শ্রেণীবদ্ধ হইবার পূর্ব্বেই যুদ্ধের ফলাফল নির্ণীত হইয়া গেল। অনেকে নিরস্ত্র-অবস্থায় আততায়ীর তরবারিমুখে —অনেকে নৌসেতু ভগ্ন হওয়ায় সন্নিহিত নদীগর্ভে প্রাণ হারাইল। হুমায়ূন্‌-পত্নী, চারি সহস্র মোগল-কুলবধূর সহিত বন্দী হইলেন। কিন্তু শের শত্রু হইয়াও, মোগল-মহিলাগণের সম্বন্ধে যে যথেষ্ট উদারতার পরিচয় দিয়াছিলেন, তাহা সকলেই স্বীকার করেন। তিনি উত্তরকালে তাঁহাদিগকে সসম্মানে প্রত্যর্পণ করিয়াছিলেন।

নিদ্রোত্থিত সম্রাট্‌ সহসা শত্রুসৈন্যের বিপুল তরঙ্গোচ্ছ্বাস দেখিয়া

অগ্রে পরিবার-পরিজনের প্রাণ ও মান বাঁচাইবার জন্য আকুল হইলেন। মহিষীর রক্ষার জন্য তখনই খাজা মুয়জ্জম্‌কে প্রেরণ করা হইল। কিন্তু তখন শত্রুর রণ-তাণ্ডবের মুখে দাঁড়ায় কাহার সাধ্য? হুমায়ূন্ আত্মরক্ষার্থ অশ্বপৃষ্ঠ হইতে নদীতে ঝাঁপ দিলেন। অতুল সুখৈশ্বর্য্যের অধিকারী, রাজরাজেশ্বর ভারত-সম্রাটের বোধ হয় এই সলিল-শয্যাই অন্তিমশয্যা হইত; কিন্তু বিধাতার কৃপায় এই সময় নিজাম্ নামে এক ভিস্তি বায়ু পূর্ণ মশক লইয়া তাঁহার প্রাণরক্ষার্থ অগ্রসর হইল। এই ভিস্তির মশকের আশ্রয়েই হুমায়ুন্ নদী পার হইয়া প্রাণরক্ষা করিয়াছিলেন।

সহৃদয় কৃতজ্ঞ সম্রাট্ ভিস্তির এই উপকারের কথা বিস্মৃত হ'ন নাই। তিনি যথাসময়ে আগ্রায় পৌঁছিয়া দীন-হীন নিজাম্‌কে প্রতিশ্রুতিমত অর্দ্ধ দিবসের জন্য (গুলবদনের মতে দুইদিন) হিন্দুস্থানের মহামান্য বাদ্‌শাহের চিরগৌরবার্হ আসনে বসাইয়া কৃতজ্ঞতার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করেন। অর্দ্ধ দিবস ভিস্তি-বাদ্‌শাহ্ খোশমেজাজে বহাল্ তবিয়তে বাদ্‌শাহী করিবার অধিকার পাইয়াছিল।

হুমায়ূনের এই ব্যবস্থায় যে অনেকেই অবমানিত ও অসন্তুষ্ট হইয়াছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই; এবং রাজ্য ও রাজনীতি হিসাবে এক নগণ্য ভিস্তিকে এরূপ মান-দান যে অশোভন ও অসঙ্গত তাহাও স্বীকার্য্য; কিন্তু এই ঘটনায় এক মুহূর্ত্তে আমরা যেন অপূর্ব্ব মধুর আরব্য-রজনীর স্বপ্নালোকের সন্ধান পাই;—মুসলমান্ মানসলোকের আরাধ্য দেবতা, উদার মহৎ

হারুণ-অল্-রশিদের চরিত্রের একাংশ আমাদের নয়ন-সম্মুখে উজ্জল হইয়া ফুটিয়া উঠে।

কিন্তু হুমায়ূন্ চৌসার রণক্ষেত্র হইতে এবার বড় মর্ম্মপীড়া, বড় অপমান বহন করিয়া ফিরিয়াছিলেন। শুধু যে পরাজয়, পলায়ন, সৈন্যক্ষয় তাঁহার এই মর্ম্মপীড়ার কারণ তাহা নহে; চৌসার রণতরঙ্গে বাদ্‌শাহী হারেমের কতিপয় সুন্দরী তৃণখণ্ডের মত কোথায় যে ভাসিয়া গেল, অনেক অনুসন্ধানেও তাহার নির্ণয় হইল না। এই নিরুদ্দিষ্টা ললনাগণের মধ্যে হুমায়ূনের পরম স্নেহের শিশুকন্যা আকীকা অন্যতমা। এই শিশুকন্যার জন্য সম্রাট্ বড়ই কাতর হইয়াছিলেন।

১৫৩৭ খ্রীষ্টাব্দে হুমায়ূন্ গৌড়ে অভিযান করেন, আর ১৫৩৯ খ্রীষ্টাব্দে চৌসার যুদ্ধ। সুতরাং দুই বৎসর পরে বাদ্‌শাহ্ আগ্রা প্রত্যাবর্ত্তন করেন। এই অত্যল্পকালের মধ্যে বাদ্‌শাহের মাথার উপর দিয়া অচিন্তিতপূর্ব্ব কতই না পরিবর্ত্তনের স্রোত বহিয়া গিয়াছে! হুমায়ূন্ তাঁহার চিরপরিচিতা প্রাণাধিকা ভগিনী গুল্‌বদনের মুখের দিকে প্রশ্নপূর্ণ বিস্মিত-দৃষ্টিতে চাহিলেন—এ কে? তিনি যেন তাহাকে চিনিয়াও চিনিতে পারিলেন না। হুমায়ূন্ গৌড়-অভিযানকালে গুলের অবিবাহিতা বালিকা-মূর্ত্তি,—শিরে কুমারীর 'তাক্'—দেখিয়া গিয়াছিলেন। আর আজ,—এ যে সদ্যোপ্রস্ফুটিত গোলাপের মত যৌবন-লাবণ্যে ঢল ঢল করিতেছে; শিরে তাহার পরিণীতা রমণীর শিরোভূষণ—লচক্!

বস্তুতঃ ইতিমধ্যে চঘ্‌তাই-বংশীয় খিজর্ খাজা খাঁর সহিত

গুলের পরিণয়-ক্রিয়া সম্পন্ন হইয়া গিয়াছিল ; তাই তাহার এ বেশ-পরিবর্ত্তন। যাহা হউক, 'পরমুহূর্ত্তেই হুমায়ূন্ তাহাকে চিনিতে পারিয়া স্নেহোদ্বেলিত আকুলকণ্ঠে বলিতে লাগিলেন,—'গুল্, প্রবাসে তোমার কথা আমার প্রায়ই মনে হইত, আর আমার মন কেমন করিত। তোমাকে সঙ্গে লইয়া যাই নাই বলিয়া আমার কতই না আপ্‌শোষের কারণ হইয়াছিল। কিন্তু তারপর ভাগ্যে যখন পরাজয় ঘটিল, তখন ভাবিলাম, ভগবান্ যাহা করেন মঙ্গলের জন্যই। তোমাকে সঙ্গে লইয়া যাইবার ইচ্ছা হয় নাই বলিয়া তৎক্ষণাৎ আমি করুণাময় খোদাকে শত শত ধন্যবাদ করিয়াছি! আকীকাকে লইয়া গিয়া কি ভুলই করিয়াছিলাম। হায়! সেই শিশুর জন্য আমার হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যাইতেছে।'

যাহা হউক অবমানিত ও মর্ম্মপীড়িত সম্রাট্ পরাজয়ের প্রতিশোধ লইবার জন্য অতঃপর উপযুক্ত আয়োজন করিয়াছিলেন। ইহার ফলে কনৌজের রণক্ষেত্রে শেরের সহিত হুমায়ূনের আর একবার সঙ্ঘর্ষ হয় (১৫৪০, মে)।

বৈমাত্রেয় ভ্রাতা কামরান্ আগ্রায় হুমায়ূনের প্রতিনিধি-স্বরূপ ছিলেন। তিনি সুসময় বুঝিয়া সৈন্যসামন্তসহ লাহোরে প্রস্থান করিলেন এবং ভগিনী গুল্‌বদন্‌কে হস্তগত করিবার অভিপ্রায়ে হুমায়ূন্‌কে বারংবার অনুরোধ করিয়া পত্র লিখিতে লাগিলেন,—'আমার বড় অসুখ। দেখিবার শুনিবার কেহ নাই। গুল্‌বদন্‌কে পত্রপাঠমাত্র এখানে পাঠাইয়া দিলে আমি যারপরনাই উপকৃত হইব।' ভ্রাতৃবৎসল, সরলমতি হুমায়ূনের হৃদয় গলিয়া গেল।

তিনি ভ্রাতার ছলনা বুঝিতে না পারিয়া, গুল্‌বদন্‌কে লাহোরে যাইবার অনুরোধ করিলেন। গুলের হৃদয় অভিমানে ভরিয়া উঠিল। হুমায়ুন্‌কে যে তিনি কিরূপ স্নেহের চক্ষে দেখেন, তাহা এক অন্তর্যামী বই আর কেহ অবগত নহে। তারপর ভাই হইয়া ভাইকে যে বিপদ্‌কালে সাহায্য না করিয়া নিজের স্বার্থসিদ্ধির পথ দেখে, হুমায়ুন্‌ গুল্‌কে তাহার নিকটে যাইতে বলিতেছেন। তিনি হুমায়ুন্‌কে অনুযোগ করিয়া লিখিলেন,—'ভাই, তুমি যে কখনও আমাকে তোমার সঙ্গসুখ হইতে বঞ্চিত করিয়া কামরানের নিকট যাইতে বলিবে, ইহা আমার ধারণারও অতীত। তুমি যাহাই বল না কেন, আমি আশৈশব যাঁহাদের অঙ্কে লালিত, বর্দ্ধিত, সেই মাতা ভগিনী বা আত্মীয়বর্গকে ছাড়িয়া কোথাও এক পা নড়িব না।'

ভগিনীর প্রতি হুমায়ুনেরও স্নেহ অল্প নহে; তিনি করুণ স্নেহপূর্ণ ভাষায় গুল্‌কে লিখিলেন,—'ভগিনী! তোমার সঙ্গ-সুখ হইতে বঞ্চিত হওয়া আদৌ আমার অভিপ্রেত নহে। তবে কামরান্‌ অসুস্থ; বারবার আমাকে অনুরোধ করিতেছে বলিয়াই তোমাকে যাইতে বলিতেছি। বিশেষ আমি এখন বড়ই বিপন্ন —সিংহাসন লইয়া চিন্তিত। এই বিপদ্‌-সাগর উত্তীর্ণ হইতে পারিলেই আবার তোমাকে আমার নিকট লইয়া আসিব।'

স্নেহের দায় বড় দায়। গুল্‌ ভ্রাতার এ স্নেহের অনুরোধ কেমন করিয়া উপেক্ষা করিবে? একান্ত অনিচ্ছাসত্ত্বেও তাহাকে কামরানের নিকট লাহোরে যাইতে হইল।

জী - ১৭৩
Acc 22726

ওদিকে বিপুল আয়োজনসত্ত্বেও দৈববিড়ম্বিত হুমায়ূন্ শের শার সহিত আঁটিয়া উঠিতে পারিলেন না। 'তরল-তরঙ্গা' তটঘাতিনী গঙ্গা সহসা রণরঙ্গিনী মূর্ত্তিতে, বাদ্‌শাহী-বাহিনীকে গ্রাস করিতে উদ্যত হইলেন। আবার গঙ্গাগর্ভে শত শত সেনার সমরলীলার অবসান হইল। হুমায়ূন্ অল্পসংখ্যক অনুচর-সহচরসহ কোনক্রমে প্রাণ লইয়া ফিরিলেন।

ফিরিলেন সত্য, কিন্তু হিন্দুস্থানের রাজসিংহাসন তখন তাঁহার নিকট 'নিশার স্বপনসম' অলীক। হৃতবল সম্রাট্ প্রবল আততায়ীর আসন্ন গ্রাস হইতে আগ্রা রক্ষা অসম্ভব জানিয়া প্রস্থান করিতে বাধ্য হইলেন।

কিন্তু স্থান কোথায়? মাথা গুঁজিয়া দাঁড়াইবার মত যৎসামান্য একটু স্থানেরও যে হুমায়ূনের একান্ত অভাব। কাল যিনি আশ্রিতের আশ্রয়,—বিশাল বিপুল হিন্দুস্থানের রাজরাজেশ্বর, ভাগ্যবিধাতা,—যাঁহার অঙ্গুলী-হেলনে শত শত বীর রণাঙ্গনে শির ডারিতে সমুৎসুক, বিধির বিধানে আজ তিনি নিতান্ত নিরাশ্রয়—পথের ফকীর! কিন্তু পথের ফকীরেরও পথের আশ্রয় নিরাপদ; হুমায়ুনের পদে পদে ভয়, পলে পলে বিভীষিকা। সম্মুখে অন্ধকার —পশ্চাতে শের শাহ্!

ভ্রাতৃগণের মধ্যে কামরান্‌ই অধিক শক্তিশালী। তিনি তখনও লাহোর পরিত্যাগ করেন নাই; কিন্তু তাঁহার আশ্রয়-গ্রহণ অপেক্ষা অরণ্যবাসও সহস্রগুণে শ্রেয়ঃ। ভ্রাতা হইয়াও তিনি শত্রুর অধম; সুযোগ এবং সুবিধা পাইলে যে-কোন মুহূর্ত্তে ভ্রাতার বুকে ছুরি

বসাইতে প্রস্তুত। কিন্তু এ দুর্দিনে তাঁহাকেই হুমায়ূনের মহা-আশ্রয় বলিয়া মনে হইল। একে তাঁহার নিজের নিঃসহায় অবস্থা, তাহার উপর হারেমের মহিলাবর্গ—বিমাতা দিল্‌দার, বৈমাত্রেয় ভগিনী গুল্‌চিহ্‌রা প্রভৃতি তাঁহার স্কন্ধে। আত্মচিন্তা অপেক্ষা অন্তঃপুর-ললনাগণের চিন্তাই তখন হুমায়ূনের সমধিক প্রবল হইয়া উঠিয়াছে। তিনি মর্ম্মভেদীকণ্ঠে ভ্রাতা হিন্দাল্‌কে ডাকিয়া বলিলেন,—'ভাই, স্নেহের পুত্তলী আকীকাকে হারাইয়া আমার পরিতাপের সীমা ছিল না। আমি কতবার তোমাদের বলিয়াছি, কেন তাহাকে আমি আমার চোখের উপরে ধরিয়া নিজের হাতে হত্যা করিলাম না! ভাই, আমার সম্মুখে আবার সেই বিষম সমস্যা উপস্থিত। পথ বিপদ্‌-সঙ্কুল; এই পথে কুল-ললনাগণকে নিরাপদে লইয়া যাওয়া নিতান্ত দুষ্কর।'

মহিলাগণকে সঙ্গে লইয়া গেলে রক্ষকহীন অবস্থায় তাঁহাদের শত্রুহস্তে পতিত হইবার সম্ভাবনা,—হতাশক্ষুণ্ণ মর্ম্মপীড়িত হুমায়ূন্‌ তাই তাঁহাদের হত্যা করিয়া নিশ্চিন্ত হইতে চাহিতেছেন। হিন্দাল্‌ ভ্রাতার বিরুদ্ধে একবার বিদ্রোহী হইয়াছিলেন সত্য, কিন্তু সে ঘটনাচক্রে। প্রকৃতপক্ষে তিনি নিষ্ঠুর বা স্নেহ-সহানুভূতিশূন্য নহেন। হুমায়ূনের চিত্তবিকার ও তাঁহার প্রস্তাবের মর্ম্ম বুঝিতে পারিয়া তিনি পুরমহিলাদের ভার স্বীয় স্কন্ধে গ্রহণ করিলেন; ভ্রাতাকে অভয় দিয়া বলিলেন,—'জীবনের শেষমুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত আমি ইঁহাদের জন্য যুঝিব, হৃদয়ের শোণিত দিয়া আমি ইঁহাদের প্রাণরক্ষা করিব।' হিন্দালের এই উক্তি শুধু অসার সান্ত্বনাতেই

পর্য্যবসিত হয় নাই; শত্রুনিক্ষিপ্ত তীরের শতধারার মধ্য দিয়া তিনি তাঁহাদের নিরাপদে লাহোরে পৌঁছাইয়া দেন।

ইহার পর হুমায়ূন্‌ও লাহোরে আসিয়া কামরানের শরণাপন্ন হইলেন। কুচক্রী কামরানের মনস্কামনা পূর্ণ হইল; ভাবিলেন, ভাগ্য এতদিনে সুপ্রসন্ন,—পথের কণ্টক আপনিই পথ বাহিয়া অনলকুণ্ডে আত্মবিসর্জ্জন করিতে আসিয়াছে! কিন্তু ধূর্ত্ত কামরান্‌ বাহিরে সে ভাবের আভাসমাত্রও প্রকাশ না করিয়া মুখে ভ্রাতৃপ্রেমের পরাকাষ্ঠা দেখাইতে লাগিলেন। সরল-স্বভাব হুমায়ূন্‌ যে কামরানের ছলনায় ভুলিবেন, তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি? তিনি নিশ্চিন্ত মনে তাঁহার সহিত কর্ত্তব্য সম্বন্ধে মন্ত্রণা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তাঁহার অপর দুই ভ্রাতা হিন্দাল্‌ ও অস্করীও অবশ্য এই মন্ত্রণায় যোগদানের অধিকার হইতে বঞ্চিত হইলেন না। কিন্তু দিনের পর দিন শুধু মন্ত্রণাই হয়, শূন্যগর্ভ বাক্‌সর্ব্বস্ব মন্ত্রণা আর কোন শুভফল প্রসব করে না;—হুমায়ূন্‌ও কোন স্থিরসিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারেন না। ভ্রাতৃদ্রোহী রাজ্যলোলুপ কামরান্‌ পরামর্শদানের ছলনায় অগ্রজকে লাহোরে ধরিয়া রাখিয়া শত্রুকর্ত্তৃক বিপন্ন করিবার চেষ্টায় ছিলেন। তাঁহার মনে এইরূপ দুরভিসন্ধি জাগিতেছিল যে, শের শাহের সহিত এই সুযোগে সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হইয়া পঞ্জাব ও লাহোর হস্তগত করিবেন। যদি একান্তই তাহাতে অকৃতকার্য্য হ'ন, তখন কাবুল লইয়া বুঝা-পড়া। কাবুল হুমায়ুনেরই প্রদত্ত রাজ্য। নিরুপায় হুমায়ূন্‌ শেষে অবশ্যই উহার জন্য লালায়িত হইবেন। কিন্তু

কাবুলের অধিকার, কামরানের জান্‌ কবুল, কিছুতেই তিনি জ্যেষ্ঠকে ছাড়িয়া দিবেন না। মনে এই দুরভিসন্ধি, সুতরাং বৈঠকে কোন প্রকার কাজের কথা উপস্থিত হইলেই কূটতর্ক তুলিয়া তিনি তাহা পণ্ড করিয়া দিতেন। এইরূপ বর্ষণহীন অসার পরামর্শের ঘনঘটায় কিছুদিন অতিবাহিত হইবার পর কামরানের মনে যাহা ছিল, তাহাই হইল—হুমায়ূনের প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী শের শাহ্‌ দিল্লী ও আগ্রা অধিকার করিয়া ক্রমে একেবারে সর্‌হিন্দে আসিয়া উপস্থিত!

মস্তকোপরি বিপদের কাল-মেঘ পুঞ্জীভূত। হুমায়ূন্‌ সহসা চক্ষু মেলিয়া চাহিয়া প্রমাদ গণিলেন; কিন্তু চিন্তার আর অবসর নাই। ক্রুদ্ধ শার্দ্দূলের গহ্বর হইতে আত্মরক্ষার জন্য তাহারই শরণাপন্ন হইতে হইল। তিনি দূতমুখে শেরকে বলিয়া পাঠাইলেন,—'এই কি ন্যায় ধর্ম্ম! আমি যে সমগ্র হিন্দুস্থান ছাড়িয়া দিয়া আসিলাম! শুধু এইটুকু—এই লাহোরের অধিকারটুকু শাহ্‌ আমাকে ছাড়িয়া দিবেন না? তিনি যে-পর্য্যন্ত অগ্রসর হইয়াছেন, তাহাই ওদিক হইতে তাঁহার বিপুল অধিকারের সীমানা নির্দ্ধারিত হউক।'

শের গর্জ্জিয়া উঠিয়া মর্ম্মান্তিক বিদ্রূপের স্বরে কহিলেন,—'কাবুল! কাবুল! আমি কাবুল কাড়িয়া লই নাই, হুমায়ূনের জন্য রাখিয়া দিয়াছি। অতঃপর ঐ কাবুলেই তাঁহাকে ফিরিতে হইবে।'

হায় রে ভু-স্বর্গ!—দেবতুল্য পিতার জীবন-মরণ-পণে অর্জ্জিত মধুর সুন্দর সুদুর্ল্লভ হিন্দুস্থান! যার ফুল্ল-কুসুমিত কুঞ্জে

শ্যামশষ্পসমাকীর্ণ প্রান্তরে, অমৃতনিস্রাবী নির্ঝরমূলে হুমায়ূন্ এতদিন স্বচ্ছন্দে বিচরণ করিয়াছেন, বিদায়! ওরে বিদায়!—সেই সোণার দেশ হইতে স্বর্গতাড়িত অভিশপ্ত আদমের ন্যায় হুমায়ূনের সুদূর সুকঠোর নির্ব্বাসন!

মোগলের উচ্ছেদকামী শের শাহ্ রণসাজে সজ্জিত,—যে কোন মুহূর্ত্তে তাঁহাদের উপর বজ্রের ন্যায় সদন্তে পতিত হইতে পারেন। সুসজ্জিত সুরম্য আবাসভবন, বহুমূল্য দুষ্প্রাপ্য বিলাস-সম্ভার যেখানে যেমন ছিল, পড়িয়া রহিল,—শঙ্কিত মোগল-পরিবার লাহোর হইতে ত্রস্তভাবে নিষ্ক্রান্ত হইলেন।

হিন্দুস্থানে অবস্থান একান্ত অসম্ভব দেখিয়া হুমায়ূন্ বদখশান্ যাইবার প্রস্তাব করিয়াছিলেন। কাবুলের মধ্য দিয়াই বদখশান্ যাইবার পথ। সন্দিগ্ধ কামরান্ শঙ্কিত হইয়া উঠিলেন—তাঁহার এতদিনের আশঙ্কা বুঝি সত্য সত্যই কার্য্যে পরিণত হয়! কাবুলের অতুল শোভাসম্পদের পথে উপনীত হইলে সেখান হইতে হুমায়ূন্ কি আর এক পদও সম্মুখে অগ্রসর হইবেন? কামরান্ অত্যন্ত তীব্রভাবে অগ্রজের কথায় প্রতিবাদ করিতে লাগিলেন।

ঘোর বিপদ্‌কালে ভ্রাতার এইরূপ নির্ম্মম আচরণে হুমায়ূন্ অতীব মর্ম্মাহত হইলেন। সম্মিলিত মোগল-বংশীয়গণ দেখিতে দেখিতে মনোমালিন্যের ফলে পথিমধ্যে বিভক্ত হইয়া পড়িল। কাবুলের জন্য একান্ত শঙ্কিত কামরান্ হুমায়ূনের সঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া নিজের সুবিধানুরূপ পথ ধরিলেন। কনিষ্ঠ অস্করী পালিত-মেষশাবকের ন্যায় নিরাপত্তিতে তাঁহার অনুবর্ত্তন করিল।

আত্মীয়স্বজন-পরিত্যক্ত, হৃতরাজ্য, হতাশ, ব্যথিতচিত্ত সম্রাট্‌কে অবশেষে সিন্ধুর মরুপ্রান্তরের পথিক হইতে হয়। সঙ্গে কতিপয় প্রভুভক্ত বিশ্বস্ত অনুচর—যাহারা শুধু সম্পদের পারাবত নহে। সম্পদে-বিপদে সম্রাটের সম-অনুরাগী, এরূপ কয়েকজন পরীক্ষিত অনুচরসহ তিনি দীর্ঘকাল মরুভূমির দেশে দেশে, বাত্যা-বিতাড়িত স্খলিত বৃক্ষপত্রের ন্যায় বিচরণ করিয়াছিলেন। ইহার বিস্তারিত বর্ণনায় আমরা পাঠকের চিত্ত ভারাক্রান্ত করিব না। বর্ত্তমান জীবনবৃত্তের জন্য এইটুকু বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, এই সময়েই হুমায়ূনের জীবনে চরম অনর্থের আবির্ভাব হয়। দুঃখ ও কষ্ট, বিঘ্ন ও বিপত্তি তাঁহার মূল্যবান্ জীবনটিকে লইয়া যেন কন্দুক-ক্রীড়ায় প্রমত্ত হইয়াছিল।

কিন্তু ঘোর দুর্গতির মধ্য দিয়া ভগবানের অদৃশ্য কল্যাণময় হস্ত যে মানুষের অভিনন্দনের জন্য কোন্ বরণডালা কিরূপে সাজাইয়া তুলেন, বুঝিয়া উঠা কঠিন। হুমায়ূন্ তাঁহার দুঃখপূর্ণ মরুপথের প্রান্ত হইতে যে অপার্থিব স্বর্গীয় কুসুম চয়ন করিতে সমর্থ হইলেন, সম্ভবতঃ সুখপূর্ণ রাজপথের পার্শ্বে তাহার সন্ধান মিলিত না।

হিন্দাল্, মাতা দিল্‌দারকে লইয়া মুলতানের পাট্ নামক স্থানে শিবির সন্নিবেশ করিয়াছেন। হুমায়ূন্ তখন তাঁহার সন্নিহিত সিন্ধুপতির আশ্রয় প্রার্থনা করিয়া লাঞ্ছিত ও প্রতারিত। এই সময় একদিন তিনি বিমাতা দিল্‌দারের সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইয়া তাঁহারই পার্শ্বে এক অপরূপ বালিকামূর্ত্তি নিরীক্ষণ করিলেন।

বালিকার চিত্তহরা রূপমাধুরী, হুমায়ূনের দাবদগ্ধ তৃষিত জীবনে কোন্ এক অপার্থিব অমৃত-নির্ঝরের মদিরস্বপ্ন বহন করিয়া আনিয়াছিল, কে বলিবে? বাদ্শাহ্ দর্শনমাত্র মুগ্ধ হইলেন। পরে যখন সংবাদ লইয়া জানিলেন, অবস্থা ভাল না হইলেও উত্তম কুলেই বালিকার জন্ম—তাঁহারই স্বর্গীয়া জননী মাহমের দূর-সম্পর্কীয় আত্মীয়কন্যা, অলভ্যা নহে, তখন তাঁহার চিত্ত ঐ চতুর্দ্দশ-বর্ষীয়া বালিকার জন্য যারপরনাই লুব্ধ হইয়া উঠিল।

কিন্তু প্রেমের পথ কুসুমাস্তীর্ণ হয় না। রূপমুগ্ধ প্রেমোন্মত্ত সম্রাট্ বালিকার দর্শনলাভের জন্য পুনঃ পুনঃ হিন্দালের শিবিরে উপস্থিত হইয়া হতাশ হইতে লাগিলেন। শত উপরোধ-অনুরোধ-সত্ত্বেও সে দ্বিতীয়বার হুমায়ূনের সমক্ষে উপস্থিত হইতে চাহিল না; এমন কি একদিন স্পষ্টাক্ষরেই এইরূপ অভিপ্রায় প্রকাশ করিল যে, তাহার বাহু যাঁহার কণ্ঠলগ্ন হইতে সমর্থ, এরূপ ব্যক্তিকেই সে পরিণয়পাশে আবদ্ধ করিতে পারে; কিন্তু এমন কাহাকেও সে স্বামিত্বে বরণ করিবে না, যাঁহার বস্ত্রপ্রান্ত স্পর্শ করিতে তাহার হস্ত পৌঁছাইবে না। বালিকার এই উক্তি হইতে উভয়ের অবস্থাগত ও মর্য্যাদাগত তারতম্য সূচিত হইতেছে বলিয়াই মনে হয়।

প্রেমের স্বভাবই বোধ হয় এই, সে বাধা পাইলে অধিকতর উদ্দাম হইয়া উঠে। বিমাতা দিল্দারের শরণাপন্ন হইয়া প্রেমোন্মত্ত সম্রাট্ বালিকার জন্য অধীরভাবে দিন গণিতে লাগিলেন। আশা ও নিরাশার প্রতিকূল ও অনুকূল তরঙ্গের মধ্যে

একটি একটি করিয়া চল্লিশ দিন অতিবাহিত হইবার পর তাঁহার মনোরথ পূর্ণ হইল। মহিষী দিল্‌দার বহু আয়াসে বালিকার মন ফিরাইতে সমর্থ হইয়াছিলেন। অতঃপর এই পটমণ্ডপেই বাসর সাজাইয়া উৎকণ্ঠিত বাদ্‌শাহের শুভপরিণয়োৎসব সুসম্পন্ন করা হয় (সেপ্টেম্বর, ১৫৪১)। ইতিহাস-প্রসিদ্ধা হামীদা বানূই এই পরিণয় বা প্রণয়-ব্যাপারের নায়িকা, এবং সসাগরা ধরণীর অধীশ্বর চিরস্মরণীয় আক্‌বর শাহ্‌ই এই পরিণয়ের অমৃতময় ফল।

কিন্তু এই শুভপরিণয়ের পর সম্রাটের অদৃষ্টাকাশ আরও ঘোরতর মেঘাচ্ছন্ন হইয়া উঠিল। কামরান্‌ ও অস্করী চিরবিরোধী, কেবল একটিমাত্র বৈমাত্রেয় ভ্রাতা তাঁহার স্বপক্ষে ; এই বিবাহে সেই হিন্দাল্‌ও তাঁহার উপর অসন্তুষ্ট হইয়া কন্দাহার চলিয়া গেলেন। সিংহাসন শত্রুকবলে। বন্ধু—বৈরী। অনুচরদল ছিন্নভিন্ন —আত্মীয়স্বজন বিমুখ। হায়, এ দুর্দ্দিনে চিরহিতৈষিণী, চিরস্নেহময়ী ভগিনী গুল্‌বদন্‌ কোথায় ?

রাজপরিবারের এই দুর্দ্দশার দিনে গুল্‌বদন্‌ কোথায় অবস্থিতি করিতেছিলেন, ইতিহাসে কোথাও তাহার উল্লেখ নাই ; কিন্তু তিনি যে কাবুলে ছিলেন, পরবর্ত্তী ঘটনা হইতে তাহা অনুমান করা যায়।

হুমায়ূনের শাসন শিথিল হইলে, ভ্রাতৃদ্রোহী কামরান্‌ সুযোগ বুঝিয়া তাঁহার বহুদিনের দুরাকাঙ্ক্ষা কার্য্যে পরিণত করিতে সচেষ্ট হইলেন। প্রথমেই তিনি হিন্দালের হস্ত হইতে কন্দাহারের অধিকার কাড়িয়া লইলেন এবং তাঁহার অনুমতি ব্যতীত স্থান

ত্যাগ করিবে না, হিন্দালের নিকট এই প্রতিশ্রুতি লইয়া তাহাকে কাবুলে তাহার মাতার নিকট পাঠাইয়া দিলেন। এই সময় কাবুলে (১৫৪৩) হিন্দালের সহিত গুল্‌বদনের সাক্ষাৎ ঘটে। ইহা হইতে অনুমান হয়, গুল্‌বদন্ তখন কাবুলে কামরানের অন্তঃপুরবাসিনী ; রাজ্যভ্রষ্ট প্রিয়ভ্রাতা হুমায়ূনের দুর্দ্দৈবে ব্যথিত চিত্তকে জননী-সেবায় ও পুত্রকন্যাপালনে সান্ত্বনাদান করিতেছেন।

হুমায়ূন্ হৃতরাজলক্ষ্মী পুনরুদ্ধারের উপায় চিন্তা করিতে লাগিলেন। কিন্তু বিরল-সুহৃদ্ ভারতবর্ষ হইতে কি উপায় হইবে ? স্থির হইল, তিনি এই দুর্দ্দিনে সাহায্যলাভের আশায় পারস্য-সম্রাট্ শাহ্ তহ্‌মাস্পের শরণাগত হইবেন।

পারস্য-গমনের সঙ্কল্প স্থির রাখিয়া হুমায়ূন্ কোয়েটার সন্নিকটে শাল্ মসতং পর্য্যন্ত অগ্রসর হইলে, হঠাৎ সংবাদ পাইলেন তাঁহার বৈমাত্রেয় ভ্রাতা অস্করী তাঁহাকে বন্দী করিবার দুরভিসন্ধিতে দুই সহস্র অশ্বারোহী সেনা লইয়া ধাবিত হইয়াছেন। অনন্যোপায় হুমায়ূন্ পলায়নের সঙ্কল্প করিলেন ; কিন্তু সঙ্গে হামীদা ও এক বৎসরের শিশু আক্‌বর। ইহাদের লইয়া পলাইবার জন্য দ্বিতীয় অশ্বও তাঁহার ছিল না। সম্রাট্ একটি অশ্বের জন্য তর্দ্দী বেগের নিকট নিষ্ফল প্রার্থনা করিয়া অবশেষে হামীদাকে নিজ অশ্বে তুলিয়া লইয়া পলায়ন করিলেন। রৌদ্রের উত্তাপে এক বৎসরের শিশুকে সঙ্গে লওয়া নিরাপদ বিবেচিত হইল না। 'হুমায়ূন্-নামায়' গুল্‌বদন্ লিখিয়াছেন, পলায়নের ত্রস্ততায় শিশুপুত্র পরিত্যক্ত হইয়াছিল। অস্করী আসিয়া দেখিলেন, পিঞ্জর শূন্য। ভ্রাতৃবৈরী

হইলেও তিনি শিশু ভ্রাতুষ্পুত্রের উপর সদয় হইয়া তাহাকে কন্দাহারে পত্নী সুল্‌তানম্‌ বেগমের নিকট পাঠাইয়া দিলেন।

হুমায়ূনের দূত চুপী বাহাদুর যখন পারস্য-সম্রাটের নিকট রাজ্যহারা, পুত্রহারা, নিরাশ্রয় নরপতির জন্য আশ্রয় ভিক্ষা করিল, তখন শাহ্‌ তহ্‌মাস্পের বিস্ময়ের অবধি রহিল না। অদৃষ্টচক্রে, ক্রূর গ্রহকোপে রাজাধিরাজ আজ তাঁহার দ্বারে ভিখারী! পারস্যরাজ স্বয়ং অশ্বারোহণে অগ্রসর হইয়া অতিথিকে সসম্মানে অভ্যর্থনা করিলেন।

উদার-হৃদয় শাহ্‌ বিপন্ন সম্রাট্‌কে বিমুখ করিলেন না;—হৃতরাজ্য পুনরুদ্ধার-সাধনে সহায়তা করিবার জন্য একদল রণনিপুণ সৈন্য দিলেন। এই মহাবল সমর-কুশল বাহিনী-সাহায্যে অস্করীর কবল হইতে কন্দাহার পুনরুদ্ধৃত হইল—সঙ্গে সঙ্গে কামরানও কাবুলের অধিকার-ভ্রষ্ট হইলেন (১৫৪৫)। বিজয়-দুন্দুভি-নিনাদে হুমায়ূন্‌ কাবুলে প্রবেশ করিলেন। দীর্ঘকাল পরে গুল্‌বদনের সহিত সাক্ষাৎ। যাঁহার কল্যাণের নিমিত্ত খোদার দরবারে নিত্য কাতর প্রার্থনা জানাইয়াছেন, যাঁহার ভাগ্যবিপর্য্যয়ে নিরন্তর নীরবে অশ্রুপাত করিয়াছেন, উদয়মুখ মিহিরের ন্যায় আজ সেই জয়শীল ভ্রাতার সাক্ষাৎ পাইয়া স্নেহময়ী ভগিনীর কি আনন্দ! গুল্‌ লিখিয়াছেন,—'পাঁচ বৎসর দীর্ঘবিচ্ছেদের পর আবার আমরা প্রিয়ভ্রাতা হুমায়ূন্‌কে পাইয়া আনন্দ-সাগরে ভাসিলাম।' ১৫৪০ খ্রীষ্টাব্দের নবেম্বর হইতে ১৫৪৫ খ্রীষ্টাব্দ—এই পাঁচ বৎসর কাল গুল্‌বদনের কাবুল-অবস্থানের ইহা অন্যতর প্রমাণ।

পরাজিত কামরান্ আপাততঃ হুমায়ূনের বশ্যতা স্বীকার করিলেন বটে, কিন্তু '১৫৪৬ খ্রীষ্টাব্দে হুমায়ুন্ যখন অস্করীর সহিত কাবুল ত্যাগ করিয়া বদখশান্ অভিমুখে অভিযান করেন, সেই সুযোগে তিনি ভ্রাতার অনিষ্ট-চেষ্টায় পুনরায় বদ্ধপরিকর হইলেন, এবং সহসা কাবুলে উপস্থিত হইয়া, বিমাতা দিল্‌দারের গৃহ অধিকার করিয়া, তাঁহাকে অন্যত্র যাইবার আদেশ দিলেন। কিন্তু এই নির্ম্মম আচরণেও কামরান্ গুলের সহিত অসদ্ব্যবহার করেন নাই; তিনি তাঁহাকে বলিয়াছিলেন,—'তুমি স্বচ্ছন্দে এখানে অবস্থান কর,—মনে করিও ইহা তোমার নিজেরই গৃহ।' কামরান্ কুসুম-সুকোমলা স্নেহময়ী ভগিনীকেই জানিতেন; মমতাময়ী নারী-প্রকৃতির অন্তরালে যে তেজস্বিনী ললনা বাস করিত,—তাহাকে চিনিতেন না। আজ তাঁহার এই অযাচিত অনুগ্রহ-দানে সহসা সে প্রচ্ছন্ন মূর্ত্তি সপ্রকাশ হইয়া বলিল, —'কেন আমি তোমার অনুগ্রহ গ্রহণ করিব? যেখানে আমার মা, আমিও সেখানে?'

কামরান্ এখন আত্মপক্ষ পুষ্ট ও দৃঢ় করিবার জন্য উদ্যোগী; তাঁহার বিশ্বাস, গুল্‌বদন্ যদি স্বামী খিজর্ খাজাকে পত্র লিখিয়া তাঁহার পক্ষ-অবলম্বনে অনুরোধ করেন, খাঁ তাহা উপেক্ষা করিতে পারিবেন না। কামরান্ তাই ভগিনীকে অনুরোধ করিলেন, —'অস্করী ও হিন্দাল্ যেমন আমার ভাই, খিজর্ খাজা খাঁও আমার নিকট ঠিক তাই। আমাকে সাহায্য করিবার এই ত সময়।' কিন্তু বুদ্ধিমতী গুল্‌বদন্ তাহাতে উত্তর দিলেন যে,

এ যাবৎ তিনি স্বামীকে কথনও কোন পত্র লেখেন নাই ; —খাঁও তাঁহার হস্তাক্ষরের সহিত পরিচিত নহেন। এখন তাঁহাকে পত্র লিখিলে তিনি উহা জাল চিঠি ভাবিতে পারেন। গুল্‌ আরও বলিলেন,—'খাঁ যখন অন্যত্র অবস্থান করেন, তখন চিঠিপত্র পুত্রকে উদ্দেশ করিয়া লেখেন।' এইরূপ বুঝাইয়া তিনি কামরান্‌কেই পত্র লিখিতে উপদেশ দিলেন। গুল্‌বদনের বয়স এ সময় ২৫ বৎসর হইবে। চাতুরী-বৃদ্ধ কামরান্‌ আজ এই বুদ্ধিমতী যুবতীর কাছে কূটনীতিতে পরাজিত হইলেন। গুলের উপদেশ সমীচীন মনে করিয়া তিনি অবিলম্বে খাঁকে সসম্মানে কাবুলে আসিবার জন্য অনুরোধ করিয়া পাঠাইলেন।

গুল্‌বদন্‌ চিরদিনই হুমায়ূনের প্রতি আন্তরিক স্নেহশীলা—তাঁহার প্রকৃত হিতৈষিণী। তিনি ইহার বহুপূর্ব্বে বারবার স্বামীকে বলিয়া রাখিয়াছিলেন,—'তোমার আর-সব ভাইরা কামরানের স্বপক্ষে থাকুক, ক্ষতি নাই ; কিন্তু ভগবান্‌ করুন, কামরানের দলভুক্ত হইবার বাসনা ঘুণাক্ষরেও যেন কথন তোমার মনে স্থান না পায়। সাবধান ! সহস্রবার সাবধান ! কথনও সম্রাট্‌ হুমায়ূনের পক্ষ ত্যাগ করিও না।' খাঁর হৃদয়ে পত্নীর সাবধান-বাণী চিরজাগরূক ছিল। কামরানের দুরভিসন্ধি ব্যর্থ হইল।

হুমায়ূন্‌ সৈন্যসংগ্রহ করিয়া, কামরানের হস্ত হইতে কাবুল পুনরুদ্ধার করিলেন (১৫৪৭, এপ্রিল)। ভীত কামরান্‌ ভ্রাতার নিকট ক্ষমা ভিক্ষা করিয়া প্রতিশ্রুত হইলেন যে, ভবিষ্যতে আর কথনও তাঁহার বিরুদ্ধাচরণ করিবেন না ;—বরং কায়মনোবাক্যে

তাঁহার সহায়তাই করিবেন। মহানুভব বাবরের পুত্র সরল-হৃদয় হুমায়ূন্ পুনঃ পুনঃ প্রতারিত হইয়াও অকৃতজ্ঞ ভ্রাতার প্রতিশ্রুতিতে বিশ্বাসস্থাপন করিতে দ্বিধা বোধ করিলেন না। বিশেষতঃ বারবার এই দুর্বৃত্তের দুর্ব্যবহার ও বিশ্বাসঘাতকতার প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাইয়াও তিনি বিস্মৃত হইতে পারেন নাই—কামরান্ বাবরের পুত্র; আর বিস্মৃত হইতে পারেন নাই তাঁহার স্বর্গগত পিতার আদেশ—'কামরানের সহিত চিরসদ্ব্যবহার করিও।' ১৫৪৮ খ্রীষ্টাব্দে সম্রাট্—হিন্দাল, অস্করী ও কামরানের সহিত সৌভ্রাতৃত্ব-বন্ধন দৃঢ় করিবার জন্য তলিকান্ নামক স্থানে এক মিলন-উৎসবের আয়োজন করেন। চারিভ্রাতা মিলিত হইলে, তিনি বলিয়াছিলেন,—"লাহোরে গুল্‌বদন্ প্রায়ই বলিত, 'আমার বড় ইচ্ছা, চারিভ্রাতাকে একবার একসঙ্গে দেখি।' আজ আমরা প্রাতঃকাল হইতে সকলে একত্র রহিয়াছি; আমার কেবল সেই কথাই বারবার মনে হইতেছে। খোদার ইচ্ছায় আমাদের এই শুভসম্মিলন তাঁহারই মঙ্গলরাজ্যে অধিষ্ঠিত হউক। অন্তর্যামী জানেন, ভ্রাতৃগণের অনিষ্ট-চিন্তা ত দূরের কথা—কোনও মুসলমানের অমঙ্গল-কামনা আমার হৃদয়ে প্রচ্ছন্নভাবেও স্থান পায় না। সর্ব্বকল্যাণাকর খোদা তোমাদিগেরও হৃদয় এমনই পবিত্র ভ্রাতৃভাব ও শুভপ্রেরণায় পূর্ণ করুন,—আমাদের আজিকার বন্ধন অটুট ও অক্ষয় হউক!"

কিন্তু ব্যর্থ বাসনা! যত্নে, সহৃদয়-ব্যবহারে কালসর্প বরং আপনার ক্রূর স্বভাব বিস্মৃত হয়, কিন্তু বারবার ক্ষমা ও সদয়-ব্যবহার লাভ করিয়াও কুটিলমতি কামরান্ আপনার হিংস্র-প্রকৃতি

ত্যাগ করিতে পারিলেন না। তিনি ভ্রাতার হস্ত হইতে রাজদণ্ড কাড়িয়া লইবার অভিপ্রায়ে পুনরায় বদ্ধপরিকর হইলেন ;—ইহাই তাঁহার শেষ উদ্যম। অতি গোপনে তাঁহার সৈন্য-সংগ্রহ হইতে লাগিল। কিন্তু সে সংবাদ হুমায়ূনের অবিদিত রহিল না। তিনি অবিলম্বে কৃতঘ্ন ভ্রাতাকে দমন করিবার জন্য হিন্দাল্‌কে সঙ্গে লইয়া যুদ্ধযাত্রা করিলেন। কামরান্‌ রাত্রিযোগে (২০শে নবেম্বর, ১৫৫১) জিরবর নামক স্থানে অতর্কিতভাবে হুমায়ূনের শিবির আক্রমণ করেন। এই অভাবনীয় বিপদ্‌পাতে হিন্দাল্‌ আত্মপ্রাণ-বিসর্জ্জনে সম্রাটের প্রাণরক্ষা করিয়াছিলেন। সে আত্মদানের করুণ কাহিনী গুলের ভাষায় আমরা লিপিবদ্ধ করিব :—

"সম্রাট্‌-সৈন্য জিরবরে উপস্থিত হইলে সংবাদ আসিল, কামরান্‌ রাত্রিযোগে হুমায়ূনের শিবির আক্রমণ করিবেন। হিন্দাল্‌ অবিলম্বে ভ্রাতা হুমায়ূনকে জানাইলেন,—'সর্ব্বোচ্চ ভূমিতে সম্রাটের শিবির সন্নিবিষ্ট হউক এবং শিশুপুত্র আক্‌বরকে লইয়া সম্রাট্‌ সুরক্ষিতভাবে তথায় অবস্থিতি করুন।'

"সম্রাট্‌ ও ভ্রাতুষ্পুত্র সম্বন্ধে এইরূপ সুব্যবস্থা করিয়া বীরশ্রেষ্ঠ হিন্দাল্‌ একে একে আপন অনুচরবর্গকে আহ্বান করিয়া বলিলেন,—'মনে রাখিও, সম্রাটের হিতার্থে তোমাদের আজীবনের অনুষ্ঠান, আজিকার একদিনের আত্মোৎসর্গের সমান। খোদার কৃপায় আজিকার অগ্নিপরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলে ধন, মান, প্রভুত্ব—যাহার যাহা কিছু বাঞ্ছা, আমি

অকাতরে আশাতীতরূপে তাহা পূর্ণ করিব।' অতঃপর যুদ্ধক্ষেত্রে প্রতি অধ্যক্ষের স্থান ও কার্য্য নির্দ্দেশ করিয়া দিয়া হিন্দাল নিজের অস্ত্র ও বর্ম্ম আনিতে বলিলেন। কিন্তু পরিচ্ছদ-রক্ষক হস্ত প্রসারণ করিবামাত্র পশ্চাতে হাঁচি পড়িল;—অমঙ্গল আশঙ্কায় তাহার আর হাত উঠিল না।

"পরে যখন অস্ত্র বর্ম্ম লইয়া রক্ষক হিন্দালের নিকট উপস্থিত হইল, রাজভ্রাতা তাহার অকারণ বিলম্বের কারণ জানিতে চাহিলেন। রক্ষক সকল কথা নিবেদন করিলে, হিন্দাল্ বলিলেন,—'ছি, ছি, তুমি ভুল করিয়াছ। অমঙ্গল-আশঙ্কায় নিবৃত্ত না হইয়া তোমার বরং বলা উচিত ছিল, খোদার আশীর্ব্বাদে আজিকার আত্মদান যেন সার্থক হয়।' তিনি উপস্থিত সকলকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন,—'বন্ধুগণ! তোমরা সাক্ষী, আমি এখন হইতে সর্ব্বপ্রকার নিষিদ্ধ ভক্ষ্য ও অন্যায়াচরণ পরিত্যাগ করিলাম।' সকলে একযোগে আশীর্ব্বচন উচ্চারণ করিলেন। হিন্দাল্ অস্ত্র বর্ম্ম পরিধান করিয়া পরিখায় পরিখায় উপস্থিত হইয়া সৈনিকগণকে উৎসাহিত করিতে লাগিলেন। সেই সময় তাঁহার জনৈক অনুচর সহসা চীৎকার করিয়া উঠিল,—'দুশমন দুশমন! খুন খুন!' হিন্দাল্ তৎক্ষণাৎ অশ্ব হইতে অবতরণ করিয়া বলিলেন,—'অসিমুখে-বিপন্ন নিজ অনুচরকে যে রক্ষা না করে, সে কাপুরুষ!' কিন্তু তাঁহার সঙ্গিগণের একজনও

অশ্ব হইতে অবতরণ করিল না। দুইবার শত্রুর আক্রমণ ব্যর্থ করিয়া হিন্দাল্‌ ধরাশায়ী হইলেন।

"মীর বাবা দোস্ত হিন্দালের মৃতদেহ বহন করিয়া তাঁহার শিবিরাবাসে লইয়া গেলেন। পাছে বাহিনীমধ্যে ভীতির সঞ্চার হয়, এই আশঙ্কায় তিনি শিবিরদ্বারে প্রহরী রাখিয়া বলিয়া দিলেন যে, রাজভ্রাতা আহত; সম্রাটের আদেশ,— কাহারও প্রবেশ নিষেধ। মীর তৎপরে সম্রাটের নিকট উপস্থিত হইয়া বিষণ্ণমুখে কহিলেন,—'মীর্জ্জা হিন্দাল্‌ আহত।' হুমায়ুন্‌ তৎক্ষণাৎ অশ্ব আনিতে আদেশ দিয়া বলিলেন,—'আমি এখনই তাহাকে দেখিতে যাইব।' মীর দৃঢ়স্বরে বলিল,—'মীর্জ্জার আঘাত সাঙ্ঘাতিক; সম্রাটের সেখানে যাওয়া যুক্তিযুক্ত নয়।' সম্রাটের আর বুঝিতে বাকি রহিল না। ব্যথিত হুমায়ুন্‌ বারবার আত্মসংযমের চেষ্টা করিলেও ধৈর্য্যের বাঁধ ভাঙ্গিয়া তাঁহার অশ্রুপ্রবাহ ছুটিল। কিন্তু কর্ত্তব্য শোকের মুখ চাহে না; বুক ভাঙ্গিয়া গেলেও সে তাহার কঠোর দায়িত্ব বিস্মৃত হয় না। অশ্রু মুছিয়া হুমায়ুন্‌ খিজর্‌ খাঁকে নির্দ্দেশ করিলেন,—'মীর্জ্জা হিন্দালের মৃতদেহ তোমার জাগীর জুই-শাহীতে লইয়া গিয়া কবরের ব্যবস্থা কর।'

"উষ্ট্রের উপর শবাধার স্থাপিত হইলে, খিজর্‌ মর্ম্মভেদী বিলাপে দিঙ্মণ্ডল মুখরিত করিয়া, তাহার মুখরজ্জু ধরিয়া ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। সে হৃদয়বিদারী স্বর

সম্রাটের শ্রুতিগোচর হইলে, তিনি বলিয়া পাঠাইলেন, 'খাঁকে বল—ধৈর্য্য বিনা উপায় নাই। এই নিদারুণ শোকে খাঁর অপেক্ষা আমি অধিকতর মর্ম্মপীড়িত, কিন্তু সম্মুখে শোণিতলোলুপ নিদারুণ শত্রু—কেবল প্রতিশোধ-তৃষ্ণায় অসীম ধৈর্য্যে হৃদয় বাঁধিয়া রাখিয়াছি।"

যৌবনের পূর্ণ গরিমায়, বীরত্বের শ্রেষ্ঠ মহিমায়, আত্মদানের অবিনশ্বর গৌরবে, তেত্রিশ বর্ষ বয়সে মীর্জ্জা হিন্দাল্ অক্ষয়লোকে প্রয়াণ করিলেন (২০ নবেম্বর, ১৫৫১)।

হিন্দালের মহিমময় মৃত্যু-সংবাদ কাবুলে পৌঁছিল। গুল্‌বদন্ বুক-ফাটা শোকে কাতর হইলেন। গুমরিয়া গুমরিয়া তাঁহার মর্ম্মরোদন কঠোর পর্ব্বতপ্রদেশ প্রতিধ্বনিত করিল। শৈশবের মধুর দিনগুলি একে একে তাঁহার স্মরণপথে উদিত হইতে লাগিল। শোকভরে তিনি লিখিয়াছেন, 'না জানি কোন্ নির্দ্দয়-হৃদয় এই নিরপরাধ যুবার অঙ্গে অস্ত্রাঘাত করিয়াছে! হায় খোদা, হিন্দালের পরিবর্ত্তে সাদৎ-ইয়ারকে লইয়া আমায় কেন পুত্রহারা করিলে না; খিজর্‌কে লইয়া আমার হৃদয়ে কেন চিরবৈধব্য বেদনা দিলে না; আর সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠবিধান আমার কেন জীবনান্ত করিলে না!'

আয় দরেঘা, আয় দরেঘা, আয় দরেঘা!
আফ্‌তাবম্ শুদ্ নিহান্ দর্ জের-ই-মেঘ্!

হায় রে, হায় রে, হায় রে দুঃখ! আমার সূর্য্য মেঘের আড়ালে ঢাকিয়া গেল!

এদিকে দুর্ব্বৃত্ত কামরানের প্রায়শ্চিত্তের দিন সন্নিকট হইয়া আসিল। হিন্দালের অকাল-মৃত্যুর পর নিষ্ঠুর নিয়তি পুনরায় সম্রাটের উপর কৃপাকটাক্ষপাত করিলেন। নৈশযুদ্ধে পরাজিত হইয়া কামরান্ নানাস্থানে পলায়ন করিয়াও আত্মরক্ষা করিতে পারিলেন না;—বন্দীরূপে সম্রাটের নিকট আনীত হইলেন। হিন্দালের মৃত্যু ও আপনার প্রতি সহস্র দুর্ব্ব্যবহারের কথা স্মরণ করিয়াও ক্ষমাশীল সম্রাট্ কামরানের প্রতি গুরুতর দণ্ডবিধান করিতে পারিলেন না —কেবল যাবজ্জীবন বন্দী করিয়া রাখিবার আজ্ঞা দিলেন।

কিন্তু সম্রাটের সদয়-বিধানে সভাস্থলে অসন্তোষের গুরু-গুঞ্জনধ্বনি উঠিল। সমবেত আমীর-উমারা, সম্ভ্রান্ত ও মধ্যবিত্তজন, সভাসদ্, সৈনিক, উচ্চনীচ সকলে একবাক্যে বলিল,—'রাজকর্ত্তব্য, সাম্রাজ্য-শাসন ভ্রাতৃবাৎসল্যের মুখাপেক্ষী নহে। এক্ষেত্রে ভ্রাতার প্রতি যদি মমতা করিতে হয়, সম্রাটের সিংহাসন পরিত্যাগ করাই শ্রেয়। আর যদি রাজপদ বাঞ্ছিত হয়, ভ্রাতৃস্নেহ বিসর্জ্জন দেওয়াই বিহিত। কিব্‌চকের সঙ্কীর্ণ গিরি-সঙ্কটে এই দুর্ব্বৃত্ত কামরান্ সম্রাটের পবিত্র মস্তকে কিরূপ সাঙ্ঘাতিক আঘাত করিয়াছিল, তাহা কি স্মরণ নাই? আফ্‌গানদের সঙ্গে ষড়্‌যন্ত্র করিয়া এই প্রতারক শঠ, মীর্জ্জা হিন্দালের প্রাণ-সংহার করিয়াছে। অসংখ্য চঘ্‌তাই ইহারই জন্য মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে। কত নিরপরাধ রমণী বন্দী হইয়া ধর্ম্ম বিসর্জ্জন দিয়াছে! আমাদের সন্তানসন্ততি-রমণীগণের উপর ভবিষ্যতে সে নিষ্ঠুর-নাট্যের পুনরভিনয় আমরা কিছুতেই ঘটিতে দিব না। পরলোকে জহান্নম্ প্রত্যক্ষ করিয়া সকলে

শপথ করিতেছি—আমাদের জীবন, স্ত্রীপুত্র, সর্ব্বস্ব সম্রাটের একগাছি কেশরক্ষার্থ অকাতরে বলি দিব। কিন্তু মুক্তকণ্ঠে বলিব, কামরান্ সম্রাটের ভাই নয়,—শমন!'

আর অধিক বাক্যব্যয় না করিয়া সকলে সমস্বরে বলিয়া উঠিল,—'যে দুর্ব্বৃত্ত ভ্রাতা রাজ্যধ্বংসকারী, তাহার শিরশ্ছেদই শ্রেয়।' কিন্তু নৃপতির নিরতিশয় ভ্রাতৃবৎসল হৃদয়, এই সঙ্গত-বিধানের অনুমোদন করিল না। অবশেষে দুর্ব্বলচিত্ত বাদ্শাহ্ অশান্ত ক্রোধের সে উচ্ছ্বসিত গর্জ্জন অবহেলা করিতে না পারিয়া, কামরান্কে অন্ধ করিয়া দিবার আদেশ দিলেন।

ভ্রাতৃদ্বন্দ্বের করাল-বহ্নি নির্ব্বাপিত হইলে, হুমায়ূনের তৃষিত চক্ষু কাবুলের গিরি-নির্ঝর-নন্দিত, তুষার-বলয়িত প্রদেশ হইতে পুনরায় দিল্লী ও আগ্রা অভিমুখে ধাবিত হইল। ১৫৫৪ খ্রীষ্টাব্দের ১৫ই নবেম্বর তিনি দ্বিতীয়বার হিন্দুস্থান-বিজয়ে অগ্রসর হইলেন, এবং পর বৎসর ২৩শে জুলাই দিল্লীতে আপনাকে সম্রাট্ বলিয়া ঘোষণা করিলেন। কিন্তু চিরবাঞ্ছিত রাজদণ্ড করগত হইবার কিছুদিন পরেই লোকান্তর হইতে সহসা তাঁহার আহ্বান আসিল। ১৫৫৬ খ্রীষ্টাব্দে, জানুয়ারীর শেষভাগে, একদিন অপরাহ্নে সম্রাট্, শের শাহ্-প্রতিষ্ঠিত শেরমণ্ডল ভবনে পাঠাগার-পরিদর্শন ও শুক্র গ্রহের উদয়কাল নির্ণয় করিতে গমন করেন। সোপান-অবতরণ-কালে সহসা পদস্খলিত হইয়া তাঁহার যে চৈতন্য বিলুপ্ত হয়, তাহা আর ফিরিয়া আসে নাই। দুর্ঘটনার তিনদিন পরে আটচল্লিশ বৎসর বয়সে চিরহতভাগ্য সম্রাট্ দুঃখ-শোক-তাপের অতীত দেশে

চলিয়া গেলেন ;—চিরবৈরী শের মৃত্যুতেও যেন শত্রুতা সাধন করিল।

শের শাহ্‌ কর্তৃক সিংহাসনচ্যুত হইয়া হুমায়ূন্‌ যখন পবন-চালিত ছিন্ন-পত্রের ন্যায় ইতস্ততঃ বিতাড়িত হইতেছিলেন, রাজ-অন্তঃপুরিকাগণ তখন ছিন্নহার কুসুমের ন্যায় বিক্ষিপ্ত। দ্বিতীয়বার সিংহাসন লাভ করিয়া, সম্রাট্‌ তাঁহাদিগকে কাবুল হইতে ভারতে আনিবার সঙ্কল্প করিয়াছিলেন ; কিন্তু নিষ্ঠুর শমন তাঁহাকে সে সাধ পূর্ণ করিতে অবসর দেয় নাই। পিতার মৃত্যুর পর বালক আক্‌বর 'সম্রাট্‌'-পদে অভিষিক্ত হইয়া, প্রায় বৎসরাবধি শত্রুদমনে ব্যাপৃত ছিলেন। এইবার সিংহাসনে দৃঢ়প্রতিষ্ঠিত হইয়া, পুরমহিলাদের আনাইবার জন্য কয়েকজন বিশ্বস্ত আমীরকে কাবুলে পাঠাইলেন।

১৫৫৭ খ্রীষ্টাব্দের প্রথম ভাগে, সম্রাট্‌-জননী হামীদা বানু, গুলবদন্‌, সলীমা, হাজী ও গুলচিহ্‌রা বেগম, অন্যান্য কর্ম্মচারিগণের মহিলাবর্গসহ পশ্চিম সিওয়ালিকস্থ মানকোটের রাজশিবিরের নিকট আসিয়া পৌঁছিলেন। আক্‌বর প্রিয়সম্মিলনোল্লাসে উৎফুল্ল-চিত্তে অগ্রসর হইলেন। শত্রুর কঠোর হুঙ্কার, কামানের কুলীশ ঝঙ্কার, অস্ত্রের বিকট ঝণৎকার এক বৎসর নিরন্তর যাঁহার কর্ণ-কুহর প্রপীড়িত করিয়াছে, প্রিয়জনের কণ্ঠস্বর যে তাঁহার পক্ষে কি আনন্দপ্রদ, তাহা ভুক্তভোগী ভিন্ন অপরের উপলব্ধি করা অসম্ভব।

বিশেষতঃ সম্রাট্ এখনও বালক, স্বার্থপর সংসারের ছায়াপাতে হৃদয় এখনও কঠিন হয় নাই। স্বজনগণকে লইয়া সম্রাট্ মানকোটের শিবিরে ফিরিয়া আসিলেন। তিনি প্রথমে মানকোট হইতে লাহোর, তৎপরে লাহোর হইতে ১৫৫৭ খ্রীষ্টাব্দের ৭ই ডিসেম্বর সপরিবারে দিল্লী যাত্রা করিলেন। এ কয়েক মাস সম্ভবতঃ রাজপরিবারবর্গ সম্রাট্-শিবিরের সন্নিকটে শিবিরাবাসে কালযাপন করিয়াছিলেন।

১৫৫৭ খ্রীষ্টাব্দে ভারতে পুনরাগমন হইতে ১৫৭৪ খ্রীষ্টাব্দে তীর্থগমন পর্য্যন্ত দীর্ঘ সতর বৎসর কাল, আমাদের এই ক্ষুদ্র আখ্যায়িকার নায়িকা, নিজ জীবনেতিহাসের উপর দুর্ভেদ্য পটক্ষেপণ করিয়াছেন। 'হুমায়ুন্-নামা' পাঠে অতি অনবহিত পাঠকেরও উপলব্ধ হয় যে, এই আত্মগরিমাশূন্যা রমণী নিজ জীবন-কাহিনী সম্বন্ধে সম্পূর্ণ উদাসীন,—একেবারে নির্ব্বাক্ বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। এমন কি প্রসঙ্গতঃ সাদৎ-ইয়ার ব্যতীত তিনি তাঁহার অপর পুত্রকন্যাগণেরও উল্লেখ করেন নাই। লোকলোচনান্তরালস্থিত মোগলের অন্তঃপুর হইতে নিবিড় অবগুণ্ঠনবতী এই রমণীর রমণীয় আখ্যান শুনিয়া তাঁহার অন্তরের সহিত ঘনিষ্ঠতর পরিচয়ের জন্য আগ্রহ হয়; কিন্তু সে প্রয়াস পুনঃ পুনঃ নিষ্ফল হইয়া ফিরিয়া আসে। কল্পনা-নেত্রে আমরা দেখিতে পাই যে নিত্যকর্ম্মের বিরামে তাঁহার অবসরকাল এখন কবিতা-রচনায়, বিবিধ পুস্তক-পাঠে, সাম্রাজ্যের সংবাদ-আলোচনায়, কদাচিৎ বা উৎসবানন্দে অতিবাহিত হইতেছে। তাঁহার প্রচ্ছন্ন জীবনের যে চিত্রটি আমাদের

মানসপটে সর্ব্বাপেক্ষা উজ্জ্বলবর্ণে ফুটিয়া উঠে, তাহা পতিসেবাপরায়ণা সহধর্ম্মিণীর এবং অপত্যস্নেহময়ী জননীর। কিন্তু এই বিদুষী প্রতিভাশালিনী রমণীকে কেবলমাত্র কল্যাণময়ী গৃহদেবীর আসনে প্রতিষ্ঠিত দেখিয়া আমাদের আকাজ্ক্ষা পরিতৃপ্ত হয় না। আশৈশব যাঁহার অন্তশ্চক্ষু এই অপূর্ব্ব দেশের অপূর্ব্ব আচার-ব্যবহার, রীতি-নীতি, শোভাসৌন্দর্য্য, শিল্পচাতুর্য্য পর্য্যবেক্ষণ করিয়া আসিয়াছে, সে সম্বন্ধে তাঁহার চিন্তাধারা কি ভাবে প্রবাহিত হইয়াছিল, তাহা জানিবার জন্য মন স্বতঃই উৎসুক হয়। কিন্তু যতদূর আবিষ্কৃত হইয়াছে, হুমায়ূন্‌-নামাতে তাহার ইঙ্গিতমাত্র পাওয়া যায় না। অন্তঃপুরবাসিনী হইলেও তিনি যে নিরন্তর অবরোধে আবদ্ধ থাকিতেন, তাহা নহে; সম্রাট্‌-শিবির-সান্নিধ্যে তাঁহার শিবির অতি সম্মানের স্থান অধিকার করিত বলিয়া ইতিহাসে যে উল্লেখ আছে, তাহাতেই অনুমিত হয়, বাহিরের আলোক তাঁহার পক্ষে দুর্ল্লভ ছিল না। সে আলোকে ভারত-মহিলাগণের যে চিত্র এই মনস্বিনীর মানস-নেত্রে উদ্ভাসিত হইত, কে বলিবে তাহা ছায়াপাতমাত্র করিয়াই মিলাইয়া গিয়াছে? ভারতের সতীধর্ম্ম, জৌহর-ব্রতের অনুষ্ঠান কি এই পতিপরায়ণা রমণীর হৃদয়ে গভীরতর রেখা অঙ্কিত করে নাই?

গুল্‌ যে কুল অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন, নারীর সতীত্ব তাহার গৌরব,—দাম্পত্য-বন্ধনে রমণীর অক্ষুণ্ণ বিশ্বস্ততা তাহার গর্ব্ব। বাবরের মাতামহী বন্দিনী হইলে তিনি বিজেতার জনৈক অনুচরের হস্তে সমর্পিতা হন। কিন্তু তেজস্বিনী আইস্‌-দৌলৎ তৎক্ষণাৎ

সেই অনুচরকে হত্যা করিবার জন্য তাঁহার পরিচারিকাকে আদেশ দেন। এরূপ করিবার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে আইস্ সগর্ব্বে বলিয়াছিলেন,—'আমি ইউনুস্ খাঁর ধর্ম্মপত্নী!' এই সংবাদ মোগল-মহিলাগণের নিশ্চয়ই অবিদিত ছিল না। গুল্‌ও পারিবারিক-ইতিহাসে দেখিয়াছেন, তাঁহার স্বজাতীয়া বহু বন্দিনী শত্রুর সহিত পরিণীতা হইয়াছে এবং তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ শত্রুর দেশে পতিসহ সুখে-স্বচ্ছন্দে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতেছে।

কিন্তু হিন্দু-মহিলাগণের দাম্পত্যজীবন ও সতীধর্ম্ম তৈমুর-বংশোদ্ভব মহিলাগণের আদর্শ হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। রাজপুত-রমণী বন্দিনী হইবার আশঙ্কায় উল্লাসে জীবন দান করে; রাজপুতগণ অসম-শত্রু কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইলে স্বহস্তে স্ত্রীপুত্র-কন্যাগণকে হত্যা করিয়া, মৃত্যুযজ্ঞে জীবনাহুতি দেয়। শৈশবে পিতৃমুখে গুল্ বহুবার এই বিস্ময়কর কাহিনী শুনিয়াছেন; কিন্তু তখন তিনি বালিকা। এখন পতিপুত্রবতী নারী,—সমাজের কঠিন সমস্যাগুলি উদারভাবে গ্রহণ করিতে শিখিয়াছেন। তারপর আক্‌বরের রাজ্যাঙ্কের প্রথমভাগে বহুবার সেই নিদারুণ মর্ম্মস্পর্শী দৃশ্যের অভিনয় হইয়াছে। মৃত্যুভয় এবং কঠোরতম যন্ত্রণা উপেক্ষা করিয়া হিন্দু-বিধবার স্বেচ্ছায় অগ্নিতে আত্মসমর্পণে, সতীধর্ম্মে গৌরবের আত্মবিসর্জ্জনে, কে জানে মুসলমান-রমণীর হৃদয় শ্রদ্ধায় পুষ্পিত হইয়া উঠিত কি না? ভ্রাতুষ্পুত্র আক্‌বরের হারেমে রাজপুত-ললনার সমাগমে গুল্‌বদন্ হিন্দু-রমণীগণের আশা-আকাঙ্ক্ষা, প্রকৃতি-প্রবৃত্তি প্রভৃতির ঘনিষ্ঠতর পরিচয় পাইবার সুযোগ

পাইয়াছিলেন। কিন্তু ভাষার অনভিজ্ঞতা সে পক্ষে বিষম অন্তরায় হইয়াছিল। গুল্ যদি সে ভাষা বুঝিতেন, রাজপুত সতীত্ব ও বীরত্বের জ্বলন্ত কাহিনী শুনিয়া তিনি যে অধিকতর মোহিত হইতেন, সন্দেহ নাই। কিন্তু একে দুর্বোধ ভাষা, তাহার উপর এই সকল হিন্দুরমণী সম্রাটের অন্তঃপুরে মুসলমান-রমণীগণ কর্তৃক কখন সমাদরে গৃহীত হন নাই। তথাপি দাম্পত্য-জীবনে এই হিন্দু-বেগমগণের নির্দ্দোষ আচরণ-দর্শনে গুল্‌বদন্ বুঝিয়াছিলেন যে, জীবনের কর্ত্তব্যপালনে দীক্ষাদান কোন ধর্ম্মেরই নিজস্ব নহে।

কিন্তু হিন্দু ও মুসলমানগণের মধ্যে ভাষা ধর্ম্ম, প্রকৃতি-প্রবৃত্তি সম্পূর্ণ বিভিন্ন হইলেও তীর্থের পবিত্রতা ও তীর্থদর্শনের ইতিকর্ত্তব্যতা সম্বন্ধে উভয় জাতি সমভাবে অনুপ্রাণিত হইত। অতঃপর যখন গুল্‌বদন্ পুনরায় আমাদের দর্শনপথে পতিত হ'ন, তখন তিনি প্রৌঢ়া রমণী, বয়স প্রায় ৫১ বৎসর,—সম্ভবতঃ বিধবা এবং মুসলমান-ধর্ম্মের অবশ্যপালনীয় পবিত্র 'হজ্'-ব্রত পালনের উদ্দেশ্যে পুণ্যতীর্থ মক্কাগমনার্থ একান্ত ব্যাকুলা। কিন্তু সম্রাট্ আক্‌বর তাঁহাকে বিদায় দিতে নিতান্ত অনিচ্ছুক ;—কেবল এখন-তখন করিয়া অকারণ কালহরণ করিতেছেন। সম্রাট্ স্বয়ং এই সময় হজ্-ব্রত পালনের জন্য একান্ত উৎসুক হইয়াছিলেন, এবং সম্ভবতঃ গুল্‌কে স্বয়ং সঙ্গে লইয়া যাইবার বাসনায় ইতস্ততঃ করিতেছিলেন। কিন্তু আপাততঃ হিন্দুস্থান পরিত্যাগ করা তাঁহার পক্ষে সম্ভবপর হইল না ; তীর্থযাত্রীর বেশে একদল মক্কাযাত্রীর সহিত আগ্রা হইতে কিছুদূর গমন করা ভিন্ন তাঁহার ঐকান্তিক কামনাকে তৃপ্তিদান

করিতে পারেন নাই। নিজে সফলকাম না হইলেও ইস্‌লাম ধর্ম্মের এই পবিত্র কর্ত্তব্যপালনে-সমুৎসুক ব্যক্তিগণকে সম্রাট্ মুক্তহস্তে অর্থসাহায্য করিতেন, এবং প্রতি বৎসর জনৈক যোগ্য ব্যক্তিকে অধিনায়ক নির্ব্বাচিত করিয়া যাত্রীদের পাথেয় প্রভৃতির ব্যয় নির্ব্বাহার্থ তাহার হস্তে উপযুক্ত অর্থ ও দ্রব্যসম্ভার দিতেন। সম্রাট্ আক্‌বর বৎসর বৎসর তীর্থগমনাকাঙ্ক্ষা এইরূপে তৃপ্ত করিতে লাগিলেন; কিন্তু গুল্‌কে তীর্থগমনে বিরত রাখা তাঁহার পক্ষে ক্রমেই দুঃসাধ্য হইয়া উঠিল। অবশেষে সম্মতি প্রদান করিয়া তিনি পিতৃষ্বসার তীর্থযাত্রার সর্ব্বপ্রকার সুব্যবস্থা করিয়া দিলেন।

তীর্থযাত্রিগণের মধ্যে গুল্‌বদনের আত্মীয়ার সংখ্যাই অধিক। আবুল্‌-ফজল্, গুলের সহযাত্রীদলের মধ্যে কেবল প্রধানা মহিলা-গণেরই নামোল্লেখ করিয়াছেন। যাত্রীদলের সমগ্র ব্যয়ভার রাজকোষ হইতে বহন করা হইয়াছিল। গুলের প্রধানা সঙ্গিনী ছিলেন—আক্‌বর-পত্নী সলীমা সুলতান্ বেগম। মুসলমান-বিধি অনুসারে সধবা স্ত্রীলোকের তীর্থগমন নিষিদ্ধ নহে,—ভার্য্যার প্রবল আগ্রহ থাকিলে তাঁহাকে তীর্থগমনে অনুমতিদান অপরিহার্য্য। সম্ভবতঃ ঐরূপ নির্ব্বন্ধাতিশয্যেই সলীমার তীর্থযাত্রা ঘটিয়াছিল। ইঁহাদের সঙ্গে ছিলেন, আক্‌বরের খুল্লতাত অস্করীর বিধবা-পত্নী সুল্‌তানাম্; কামরানের দুই কন্যা—হাজী ও গুল্‌-ইজার বেগম; এবং গুল্‌বদনের পৌত্রী উম্‌-ই-কুলসুম্;—ইঁ। সাদৎ-ইয়ারের কন্যা কি না উল্লিখিত নাই। তালিকায় শেষ নাম খিজর্ খাজা-

দুহিতা সলীমা খানম্‌—গুল্‌বদনের গর্ভজাত কন্যা কি না তাহাও অজ্ঞাত।

ফতেপুর-সীক্‌রীতে যাত্রীদলের এক সঙ্গে মিলিত হইবার স্থান নির্দ্দিষ্ট ছিল, এবং ১৫৭৫ খ্রীষ্টাব্দের ১৫ই অক্টোবর যাত্রার দিন স্থিরীকৃত হয়। আগ্রা হইতে যাত্রা করিয়া গুল্‌বদনের সহযাত্রীরা একসঙ্গে সম্মিলিত হইলেন। সাধারণতঃ (মুসলমান) বৎসরের দশম মাসেই তীর্থগমনোদ্দেশে যাত্রীদল আগ্রা ত্যাগ করিত; কিন্তু গুল্‌বদন্‌ প্রভৃতি সপ্তম মাসেই যাত্রা করিয়াছিলেন। ইহার কারণ বোধ হয়, মহিলাগণের পক্ষে ক্লেশসহিষ্ণু সাধারণ যাত্রীদের ন্যায় দ্রুতগমন সম্ভবপর নহে। আত্মীয়াগণকে পথে কিয়দ্দূর সঙ্গদান করিবার নিমিত্ত সম্রাটের দুই পুত্র—সলীম্‌ ও মুরাদ যাত্রীদলের সহচর হইলেন। কুমারদ্বয়ের বয়ঃক্রম তখন যথাক্রমে পাঁচ ও চারি বৎসর। প্রথম বিশ্রামস্থান অবধি অগ্রসর করিয়া দিয়া যুবরাজ সলীম্‌ বিদায় লইয়া আগ্রায় ফিরিলেন। কথা ছিল, মুরাদ্‌ সুরাট বন্দর পর্য্যন্ত পৌঁছাইয়া দিবেন। গুলবদন্‌ শিশু মুরাদকে সে ক্লেশকর ও শ্রমসাধ্য কার্য্য হইতে নিরস্ত করিলেন। যাত্রীদলের প্রকৃত রক্ষণাবেক্ষণের ভার অর্পিত হইয়াছিল—মুহম্মদ্‌ বাকী খাঁ কূকা, রূমী খাঁ-প্রমুখ আমীরবর্গের উপর।

গুলের বর্ণনাকুশল লিপিচাতুর্য্যময়ী লেখনী এই অজ্ঞানিত বিঘ্নবিপদ্‌সঙ্কুল সমুদ্রপথ, অপূর্ব্ব দৃশ্যদর্শন বা পুণ্যব্রতানুষ্ঠানের কোন বিবরণ লিপিবদ্ধ করে নাই। সুরাট হইতে সমুদ্রযাত্রা নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল সত্য, কিন্তু এই বন্দর সবে বৎসর দুইমাত্র সাম্রাজ্যভুক্ত

হইয়াছে; তখনও সুশাসন প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। পথ বিপদাকীর্ণ, গ্রামবাসী রাজপুতগণ নবীন বন্ধন ছেদন করিবার জন্য সশস্ত্র ফিরিতেছে। সম্ভবতঃ রাজআত্মীয়াগণকে বাদশাহী ফৌজের সাহায্যে এক সেনা-নিবাস হইতে অপর সেনা-নিবাস পর্য্যন্ত নিরাপদ পথ-অবলম্বনে গমন করিতে হয়। মোগল-সৈন্য তখন রাজপুতকুলতিলক রাণা প্রতাপের বিরুদ্ধে নিযুক্ত; অনুমান হয়, যাত্রীদল এই বাহিনী-সহায়ে, অবসাদক্লিষ্ট বক্রপথে গোগুণ্ডা হইতে আহ্‌মদাবাদ, এবং তথা হইতে জলপথে সুরাট গমন করেন।

সমুদ্রপথ সে সময় নিরাপদ থাকিলেও যাত্রিগণকে এক বৎসর বন্দরে অপেক্ষা করিতে হইয়াছিল। আকবর-নামায় প্রকাশ, সমুদ্রযাত্রার জন্য রাজ-অর্ণবপোত 'ইলাহী' নির্দ্দিষ্ট ছিল। ইহা ছাড়া 'সলীমী' নামক তুর্কী জাহাজও ভাড়া করা হয়। রাজমহিলাগণ 'সলীমীতে' আরোহণ করিলে, 'ইলাহী'-আরোহিণীগণের মধ্যে অকারণ পর্ত্তুগীজ-জলদস্যু-ভীতি সঞ্চারিত হইয়াছিল। কিন্তু ইহাই বিলম্বের প্রকৃত কারণ বলিয়া মনে হয় না। ভারতসাগরে পর্ত্তুগীজগণের তখন প্রবল প্রতাপ; যথারীতি শুল্ক দিতে না পারিলে জলযাত্রার অনুমতি-পত্র মিলিত না। মিলিলেও তাহাতে ত্রাসের অবসান হইত না,—গুল্মাচ্ছাদিত কূপের ন্যায় অনেক সময় ছাড়পত্রে সাঙ্কেতিক ভাষায় হত্যার ইঙ্গিত প্রচ্ছন্ন থাকিত। যাহা হউক, এই অনুমতি-পত্রের অভাবই যে বিলম্বের কারণ তাহাতে সন্দেহ নাই।*

* পর্ত্তুগীজদিগকে দামানের নিকটবর্ত্তী বুল্‌সার গ্রামখানির অধিকার দিয়া,

মীর হজ্‌ সমস্ত বিঘ্নবিপত্তির কথা সম্রাট্‌কে জানাইলেন। অবিলম্বে সুরাটে উপস্থিত হইয়া যাত্রীদলের সমস্ত অসুবিধা দূর করিয়া যাত্রার সুবন্দোবস্ত করিবার জন্য সম্রাট্‌ ঈদরের ফৌজদার কিলিচ্‌ খাঁকে আদেশ দিলেন। কিলিচ্‌ কাম্বের জনৈক বণিক কল্যাণ রায়কে সঙ্গে লইয়া সুরাটে পৌঁছিলেন। এই বণিকের সাহায্যেই তিনি যাত্রীদলের ছাড়পত্র সংগ্রহ করিয়া দিয়া, যাত্রার সমস্ত বাধাবিপত্তি দূর করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। (*Akbarnama*, iii. 276 *n*.)

স্থলপথে এই সকল বাধাবিপত্তির ফলে সমুদ্রযাত্রা করিতে গুল্‌বদনের এক বৎসর বিলম্ব হইয়া গেল। অবশেষে ১৫৭৬ খ্রীষ্টাব্দের ১৭ই অক্টোবর তারিখে পয়গম্বরের পবিত্র নাম উচ্চারণ করিয়া যাত্রীরা জলপথে যাত্রা করিলেন। সুরাট হইতে একসঙ্গে যাত্রা করিলেও মধ্যপথে উভয় পোত বিচ্ছিন্ন হইয়া একখানি আরব-উপসাগর, অন্যখানি পারস্য-উপসাগরের পথে গমন করে। অভীষ্ট তীর্থে কোন্‌খানি কোন্‌ বন্দরে উপস্থিত হইয়াছিল, ইতিহাসে তাহার উল্লেখ নাই।

যাহা হউক, গুল্‌বদন্‌ সহযাত্রীদের সহিত নিরাপদে আরবে

গুল্‌বদন্‌ তাহাদের নিকট হইতে তীর্থগমনের আবশ্যক ছাড়পত্র সংগ্রহ করিয়াছিলেন। সম্রাটের আদেশমত তিনি যে এরূপ করেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। তীর্থ হইতে ফিরিয়া তিনি রাজকর্ম্মচারিগণকে পর্ত্তুগীজ দিগের হস্ত হইতে বুল্‌সার গ্রাম কাড়িয়া লইতে আদেশ দিয়াছিলেন।—Monserrate's *Mongolicae Legationis Commentarius* ed. by. H. Hosten, p. 625.

উপনীত হইয়া সেখানে সাড়ে তিন বৎসর অবস্থিতি করেন। এই দীর্ঘ সময়ের মধ্যে তিনি চারিবার [কর্‌বলা, কুম্‌, মশহদ্‌ ও মক্কা] হজ্‌-ব্রত পালন করিবার সুযোগ পাইয়াছিলেন।

কিন্তু এই বহু আয়াসসাধ্য ক্লেশকর বিঘ্নবিপদ্‌সঙ্কুল তীর্থ-পর্য্যটনের অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য ও নিগূঢ় রহস্য কি, তাহা ভালরূপ হৃদয়ঙ্গম করিতে না পারিলে চিরতৃষাতুর জ্ঞানস্পৃহা পরিতৃপ্ত হয় না। যীশুর পবিত্রভূমি পালেষ্টাইন্‌, মুহম্মদের মক্কা, বুদ্ধের গয়া, হিন্দুর বারানসী-বৃন্দাবন কেবল কি বিভিন্ন দেশবাসীর সম্মিলনভূমি —লৌকিক আচার-ব্যবহার আদান-প্রদানের সাধারণ ক্ষেত্র, অথবা এই তীর্থযাত্রার কোন মহত্তর অভিপ্রায় আছে? কেন এই সর্ব্বদেশ সাধারণ বায়ু-বহ্নি-ব্যোম-অধিষ্ঠিত স্থানদর্শনের জন্য এত আকাঙ্ক্ষা, এত আগ্রহ, এত ক্লেশকর উদ্যম? গৃহসুখ, জীবনের চিরাভ্যস্ত পথ পরিত্যাগ করিয়া, কেন অজানিত বিঘ্নবিপদ্‌মুখে উল্লাসে আত্মসমর্পণ? আবার কেনই বা তাহার আচার-অনুষ্ঠান, ক্রিয়াকলাপ সযত্নে পালন? মক্কার তিন ক্রোশ ব্যবধানে তীর্থ-পরিচ্ছদ্‌ (ইহ্‌রাম্‌) পরিধান; গমনপথে তীর্থ-মাহাত্ম্য-গান; সঙ্কল্পসিদ্ধি এবং ক্রটিহীন দর্শনের জন্য সকাতর প্রার্থনা; সেই পবিত্র নিকষকৃষ্ণ প্রস্তরের স্পর্শ এবং অভিবাদন; সপ্তবার পুণ্যময়ী কাবা-পরিক্রমা; পবিত্র 'সফা' শৈলে আরোহণ এবং তদুপরি আন্তরিক প্রার্থনা-সহকারে পরিত্রাতা খোদার পদে আত্মনিবেদন; সফা হইতে মার্‌ওয়া শৈলে সপ্তবার দ্রুতগমনাগমন; প্রধান মস্‌জিদে সমবেত উপাসনা ও তথায় বিশ্বাসী-সম্প্রদায়ের

প্রতি ধর্ম্মোপদেশ-শ্রবণ ; অষ্টম দিবসে তীর্থে তীর্থে প্রার্থনা ; দশাহে মীনাস্তম্ভনিচয়ের উপর লোষ্ট্রনিক্ষেপপূর্ব্বক সয়তান-নির্যাতন এবং এই দিবসেই পুণ্যময় হজ্‌ ক্রিয়া বা পশু-বলিদান। (*Ency. of Islam*, 'Hadjdj', pp. 196-201). পর পর এই সকল অনুষ্ঠানের নিগূঢ় রহস্য কি, কে বলিবে ? মনস্বিনী গুল্‌ এই সকল শাস্ত্রাদেশ পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পালন করিয়াছিলেন, সন্দেহ নাই। কেবল তাহাই নহে, দীর্ঘকাল তীর্থবাসে তিনি যে মদিনা-দর্শন এবং আরবের স্থানে স্থানে সাধু মহাত্মগণের সমাধিস্থলে শ্রদ্ধার অর্ঘ্য দান করিতে গিয়াছিলেন, তাহা সহজেই অনুমেয়। কিন্তু কি অপূর্ব্ব প্রেরণায় এই আয়াসসাধ্য আনুষ্ঠানিক আচার-সমূহ তিনি পালন করিয়াছিলেন, কি অলৌকিক উন্মাদনায় সন্তানসন্ততি প্রিয়পরিজনবর্গের মমতা, অধ্যয়নশীল নিশ্চিন্ত জীবন পরিহার করিয়া স্বেচ্ছায় সাগ্রহে তীর্থযাত্রার দুঃসহ ক্লেশভার বহন করিয়াছিলেন ; পবিত্র তীর্থভূমি প্রথম চুম্বন করিয়া চিরঈপ্সিত দূর মন্দিরশীর্ষ-দর্শনে এই প্রগাঢ় ভক্তিমতি মহিলার অন্তরে কি ভাবের উদয় হইয়াছিল ; কি ভাবে বিভোর হইয়া সাম্রাজ্যের সুখৈশ্বর্য্য ভুলিয়া সার্দ্ধ তিন বৎসর কাল আমাদের বিদুষী বাদ্‌শাহ-জাদী আরবের মরুময় প্রদেশে প্রবাসযাপন করিয়াছিলেন—সে অপূর্ব্ব হৃদয়-রহস্য আত্মগোপনপ্রিয়া গুলের সহিত চিরান্তরিত হইয়াছে ;—কৌতূহলের শত চেষ্টাতেও সে প্রহেলিকা-দ্বার উদ্‌ঘাটিত হইবে না।

১৫৭৯ খ্রীষ্টাব্দে সঙ্গিনীদের লইয়া গুল্‌বদন্‌ ভারতাভিমুখে যাত্রা

করিলে, পুনর্যাত্রার মীর হজ্ (অধিনায়ক) হইয়াছিলেন—খাজা ইয়াহিয়া। এই অনিশ্চিত বিপদ্‌সঙ্কুল পুনর্যাত্রার বিবরণ ঘটনা-বৈচিত্র্যে বিস্ময়কর। প্রথমতঃ এডেনের অনতিদূরে পোতমগ্ন হইয়া যাত্রীদলকে কিছুদিন সেই জনবিরল স্থানে অবস্থিতি করিতে হয়। তখনকার এডেনে এখনকার মত তৃষ্ণার্ত্তের তৃপ্তিকর বরফ, অনাবৃষ্টির অভাব, এবং ব্রিটিশরাজের প্রতিষ্ঠা ছিল না। দ্বিতীয়তঃ, সেখানকার শাসনকর্ত্তা যাত্রীদলের সহিত সদ্ব্যবহার করেন নাই,—যদিচ এই বিসদৃশ আচরণের জন্য তিনি প্রভু—তুর্কী অধিপতি তৃতীয় মুরাদের নিকট দণ্ডিত হইয়াছিলেন। কেবল একটিমাত্র সুখকর ঘটনায় এই উত্তপ্ত পর্ব্বত-পরিবেষ্টিত স্থলে সুদীর্ঘ প্রবাসপীড়িত যাত্রীদলের নিরাশ-তমসাচ্ছন্ন হৃদয়ে আশার আলোক সঞ্চারিত হইয়াছিল। ১৫৮০ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে দেখা গেল, দক্ষিণ দিক্ হইতে অনুকূল পবনে একখানি জাহাজ আসিতেছে। জাহাজ কাহার, জানিবার জন্য গুল্-ইজার ও খাজা ইয়াহিয়ার সহিত যুক্তি করিয়া গুল্‌বদন্, একখানি নৌকা পাঠাইয়া দিলেন। সৌভাগ্যক্রমে ঐ জাহাজের আরোহী ছিলেন সম্রাটের জনৈক কর্ম্মচারী বায়াজীদ্ বীয়াৎ ও তাঁহার স্ত্রীপুত্র। অনুকূল পবনের দুর্লভ সুযোগ উপেক্ষা করিয়া বায়াজীদ্ স্বীয় পোতের গতিরোধ করাইয়া, সংবাদ আদান প্রদানপূর্ব্বক রাজপরিবারের অবস্থা-সঙ্কট বুঝিলেন; সম্ভবতঃ তাঁহারই চেষ্টায় বেগমগণের ভারত-প্রত্যাগমনের জন্য জাহাজের সুব্যবস্থা হইয়াছিল। (*J. A. S. B.*, 1898, p. 315.)

ঠিক কোন্ সময়ে রাজপরিবার এডেন ত্যাগ করেন, অথবা

কখন তাঁহারা সুরাটে আসিয়া উপনীত হন, তাহা নিশ্চিতরূপে জানা যায় না। (*A. Nama*, iii. 570*n*'). আবুল-ফজ্‌লের মতে সাত মাস, বদায়ূনীর মতে এক বৎসর, গুল্‌বদন্‌কে এডেনে অবস্থান করিতে হইয়াছিল। তবে এ কথা ঠিক যে, ১৫৮০ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে বায়াজীদের জাহাজ যখন এডেনের নিকটবর্ত্তী হয়, তখন যাত্রীদল সেখানে অপেক্ষা করিতেছিলেন। যাত্রীদল এডেন হইতে যাত্রা করিয়া সুরাট বন্দরে অবতরণ করিলে, সেখানে অতিরিক্ত বৃষ্টিপাত সুরু হয়। সম্রাট্ও তখন সুদূর কাবুলে (জবুলিস্থানে)। সুতরাং রাজপরিবারবর্গ দীর্ঘকালের জন্য সুরাটে অবস্থান করিতে বাধ্য হইলেন। অবশেষে ১৫৮২ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ্চ মাসে সকলে ফতেপুর-সীক্‌রীতে উপনীত হন।

রাজধানী ফিরিবার মুখে গুল্‌বদন্‌ ও অন্যান্য মহিলারা আজ্‌মীরে চিশ্‌তী ফকীরদিগের পুণ্যপীঠ-দর্শনে গমন করেন। তথায় কুমার সলীমের (জহাঙ্গীর) সহিত তাঁহাদের সাক্ষাৎ হয়। তখন প্রায় প্রত্যহ এক একজন আমীর সম্রাটের অভিবাদন ও সাদর-সম্ভাষণ বহন করিয়া গুল্‌বদনের নিকট আসিতে লাগিলেন। অবশেষে ভরতপুর-রাজ্যের খানুয়া নামক স্থানে বেগমদিগের সহিত সম্রাটের সম্মিলন হয় (১৫৮২ এপ্রিল)।

ফতেপুর-সীক্‌রীতে এক বিসদৃশ ব্যাপার গুল্‌বদনের স্বভাবতঃ স্থির চিত্তকে বিচলিত করিল। গুল্‌ দেখিলেন, ধর্ম্মযাজক একোয়াভাইভা কুমার মুরাদ্‌কে খ্রীষ্টধর্ম্মের নীতি শিক্ষা দিতেছেন। আক্‌বর যে খ্রীষ্টধর্ম্মের পবিত্র নিদর্শন-সমূহের উপর প্রগাঢ় শ্রদ্ধাবান্‌ এবং

এই ধর্ম্মপ্রাণ বিদ্বান্ মিশনরীকে বিশেষ প্রীতির চক্ষে দেখেন, সে কথাও গুল্ শুনিতে পাইলেন। একোয়াভাইভা বলেন, খ্রীষ্টধর্ম্মের প্রতি সম্রাটের এই প্রীতিদৃষ্টিতে হামীদা বানূ ও হারেমের অন্যান্য বেগমেরা সাতিশয় অপ্রসন্ন হইয়া উঠিলেন, এবং ইঁহাদের অসন্তোষ-ধ্বনি যে, গুল্‌বদন্ ও সম্রাটের হিন্দুপত্নীগণের কণ্ঠনিঃসৃত বিলাপে পরিবর্দ্ধিত হইয়াছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। সমগ্র হারেমের প্রতিকূলতায় সম্রাট্ একোয়াভাইভাকে আর আশ্রয় দিতে পারিলেন না।

তীর্থ হইতে ফিরিয়া গুল্‌বদন্ আগ্রার রাজভবনে 'হুমায়ুন-নামা' রচনা করিতে আরম্ভ করেন। তাঁহার রচনা-পাঠে পাঠকের কল্পনা-নেত্রে যে চিত্র ভাসিয়া উঠে, তাহা পাণ্ডিত্যাভিমানী বিদুষীর নহে, —ভ্রাতৃস্নেহে আত্মবিস্মৃতা ভগিনীর। যে জীবন ভ্রাতার সেবায়, ভ্রাতার মঙ্গলকামনায় অতিবাহিত হইয়াছিল, তাহার সমাপ্তি—ভ্রাতার জীবনকাহিনী-রচনায়। কিন্তু ইহাই তাঁহার একমাত্র রচনা নহে; সেকালের রীতি অনুসারে গুল্ বহু ফার্সী কবিতা রচনা করিয়াছিলেন। সাহিত্যে যে তাঁহার প্রগাঢ় অনুরাগ ও জ্ঞানস্পৃহা অতীব বলবতী ছিল, তাহা তাঁহার সংগৃহীত গ্রন্থরাশি ও প্রতিষ্ঠিত পুস্তকাগার হইতে নিঃসংশয়ে অনুমান করা যায়। মীর মহ্‌দী শীরাজী-রচিত 'তাজ্‌কিরতুল্ খওয়াতীনে' গুলের কোন কবিতার এই দুইটি চরণ উদ্ধৃত আছে:—

"হর্ পরী কে উ বা-আশিক্-ই-খুদ্ ইয়ার নীস্ত্।
তু ইয়াকীন্ মীদান্ কে হেচ্ অজ্ উমর্ বর্-খুরদার্ নীস্ত!"

—নিজ প্রেমিকের প্রতি বিমুখ পরী! তুমি নিশ্চয় জানিও যে,

কেহই জীবন রূপ ফল পূর্ণরূপে আস্বাদন করে না।—অর্থাৎ, জীবন নশ্বর, তাহার মধ্যেই যতটুকু পার সুখভোগ করিয়া লও।

সাম্রাজ্যের শাসন-সংরক্ষণে বা রাজনৈতিক ব্যাপারে গুল্‌বদন্‌ কখন হস্তক্ষেপ করিতেন না। দুর্গাবতী বা চাঁদ সুল্‌তানার ন্যায় অরিহৃদয়ে, অসিমুখে রক্তরেখায় তাঁহার নাম কখন লিখিত হয় নাই সত্য; কিন্তু দীনদুঃখীর অন্তরে কৃতজ্ঞতার উজ্জ্বল অক্ষরে করুণাময়ী স্বয়ং যে নাম লিখিয়াছিলেন, তাহা খোদার পুণ্য নামের সহিত নিত্য উচ্চারিত হইত।

অবরোধ-প্রথার প্রচলনে ভারত-মহিলাগণের কার্য্যের পরিধি অতি সঙ্কীর্ণ; কদাচিৎ অন্তঃপুর-নেপথ্যের বহির্ভাগে সংসার-রঙ্গমঞ্চের উপরে তাঁহাদের গৌরবাভিনয় প্রদর্শিত হয়; তথাপি এই নেপথ্যাভিনয়ের অলক্ষ্য প্রভাব মানব অন্তরে অন্তরে অনুভব করে;—গুল্‌ তাহার উজ্জ্বল দৃষ্টান্তস্থল। বাবর-দুহিতা বালিকা গুল্‌ পিতার অসীম স্নেহপাত্রী ছিলেন; পরে হুমায়ূনের রাজত্বকালে সুখে দুঃখে ভ্রাতৃমুখে স্নেহময়ী ভগিনীর নাম; অতঃপর ভ্রাতুষ্পুত্র আক্‌বর পিতৃষ্বসাকে যে অসীম শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিতেন, ইতিহাসে সে নিদর্শনের অভাব নাই। সম্রাট্‌ অনেকবার তাঁহাকে ধনরত্ন উপহার দিয়াছেন (Badauni, ii. 332) এবং তাঁহার কোন উপরোধ কখন উপেক্ষা করেন নাই। গুলবদন্‌ ও পত্নী সলীমা সুলতানের অনুরোধেই তিনি শাহ্‌জাদা সলীমের বিদ্রোহ অপরাধ ক্ষমা করিয়াছিলেন। কে বলিবে এইরূপ কত গুরুতর ব্যাপারে

এই ধর্ম্মপ্রাণা মহিলার অদৃশ্য প্রভাব উদ্যত অশনির পতনরোধ না করিয়াছে? পর পর ভারতের দুইজন প্রতাপশালী সম্রাট্কে কল্যাণের পথে চালনা করিয়া সাম্রাজ্য ও সংসারের প্রভূত মঙ্গলসাধন করিয়াছে?

সংসারে একজাতীয়া নারী আছেন যাঁহাদিগের সাহস ও বীর্য্যবত্তা বীরকার্য্যে ব্যক্ত হয় না;—ব্যক্ত হয় নীরব সহিষ্ণুতায়;—যাঁহাদিগের কার্য্যের অভিব্যক্তি কল্যাণে। গুল্ সেই শ্রেণীর মহিলা। সূর্য্য নীরবে উদিত হন—নীরবে অস্ত যান; কিন্তু তাঁহারই আলোকে এই বৈচিত্র্যময়ী সৃষ্টি মানবের দৃষ্টিগোচর হয়। ইতিহাস যে-সকল কীর্ত্তি গৌরবে কীর্ত্তন করে, গুল্ সেরূপ কীর্ত্তিশালিনী ছিলেন না; কিন্তু উদীয়মান মোগল-সাম্রাজ্যের উপর এই বিদুষী মহিলা হুমায়ূন্-নামায় যে উজ্জ্বল আলোকপাত করিয়াছেন, তাহাই তাঁহার জীবনের অপূর্ব্ব গৌরবময়ী কীর্ত্তি, এবং সেইজন্যই তিনি ইতিহাস-সেবিগণের কৃতজ্ঞতা ও অক্ষয় শ্রদ্ধার অধিকারিণী। গুল্বদনের গৌরব-সৌরভ ঐতিহাসিক জগৎকে চির-আমোদিত করিবে।

গুল্বদনের আয়ু-সূর্য্য ধীরে ধীরে অস্তাচল অভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিল; জীবনালোক ম্লান হইয়া আসিতেছে। মৃত্যুর দূরপ্রসারিণী দীর্ঘছায়াপাতে চক্ষু জ্যোতিঃহীন; কিন্তু ধর্ম্ম, পুণ্য, পবিত্রতায় তাঁহার অন্তরের দীপ্তি উজ্জ্বলতর হইয়া উঠিতেছে। ইতিমধ্যে একবারমাত্র ইতিহাসে প্রসঙ্গতঃ তাঁহার নামোল্লেখ দেখা যায়—গুলের বয়ক্রম তখন ৭০ বৎসর। আক্বর-নামায়

প্রকাশ, সেই সময় তাঁহার দৌহিত্র মুহম্মদ্-ইয়ার সম্রাটের বিরাগ-ভাজন হইয়া রাজদরবার পরিত্যাগ করেন।

ইহার পর আরও দশ বৎসর কাটিয়া গেল। আকবরের অর্দ্ধ শতাব্দীব্যাপী রাজ্যের দীর্ঘ দিবাও অবসানপ্রায়। গুলের জীবনে কাল-রজনী উদিত হইল। ১৬০৩ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে অশীতিবর্ষ বয়সে গুল্ আগ্রায় শেষ শয্যা গ্রহণ করিলেন। জীবনের শেষ মুহূর্ত্তেও চিরসঙ্গিনী হামীদা তাঁহার শয্যাপার্শ্বে,—ননদিনীর শুশ্রূষাভার আর কাহারও হস্তে দিয়া তিনি নিশ্চিন্ত নহেন। হামীদা ননদিনীকে আদরে 'জিউ' (মহাশয়া) বলিয়া সম্ভাষণ করিতেন। যখন দেখিলেন, অন্তিম শয্যাশায়িনীর চক্ষে মৃত্যুর করাল ছায়া ঘনাইয়া আসিতেছে,—রুগ্ন ভগ্নদেহ হইতে চিরমুক্তি লাভ করিবার জন্য জীবনশ্বাস চঞ্চল হইয়াছে, তখন তিনি স্নেহভরে চিরতরে একবার শেষসম্ভাষণ করিলেন—'জিউ'? উত্তর না পাইয়া হামীদা পুনরায় নাম ধরিয়া ডাকিলেন—'গুল্‌বদন্'? মুমূর্ষু ধীরে ধীরে চক্ষুরুন্মীলন করিয়া ভগ্নকণ্ঠে বহুকষ্টে বলিলেন—'আমি মরিতেছি, তুমি চিরজীবিনী হও।' যে চক্ষু মোগল-ভাগ্যরবির প্রাতরুত্থান দেখিয়াছিল, তাহা চিরনিমিলিত হইল।

পিতৃষ্বসার প্রতি অসীম শ্রদ্ধাবান্ সম্রাট্ আকবর কিছুদূর শবাধার বহন করিয়া চলিলেন। নীরব অশ্রুপাত ও ভাষাহীন দীর্ঘশ্বাস তাঁহার মর্ম্মবেদনার পরিচয় দিতে লাগিল। দেহচ্যুত আত্মার শান্তির নিমিত্ত বৃদ্ধ সম্রাট্ সৎকার্য্যে অকাতরে অর্থব্যয় করিলেন। মৃণ্ময় দেহ মৃত্তিকায় সমাহিত হইল।

কিন্তু ধর্ম্মে প্রগাঢ় নিষ্ঠাবতী, কর্ম্মে কর্ত্তব্যপরায়ণা, পতিপুত্র-পরিজনে একান্ত স্নেহশালিনী, সৌজন্য ও সারল্যের প্রতিমা গুল্, শমনের অন্তঃপুর সমাধির অভ্যন্তর হইতে কালের নিবিড় আবরণ ভেদ করিয়া আমাদের মানস-পটে উদিত হন। তখন মনে হয়, যেন চিরপরিচিত সুহৃদ্‌কে হারাইয়াছি!

হুমায়ূন্-নামা

বিংশ শতাব্দীর পূর্ব্বে যাঁহারা মোগল-রাজবংশের কথা আলোচনা করিয়া গিয়াছেন, তাঁহাদের কেহই গুলবদনের 'হুমায়ূন্-নামা'র সহিত পরিচিত ছিলেন না। সুপণ্ডিত ব্লকম্যানের পক্ষে ফার্সী পুঁথির সহিত পরিচয়লাভের বিশেষ সুযোগ-সুবিধা ছিল; কিন্তু গুল্‌বদন্ বেগমের হুমায়ূন্-নামার কথা তাঁহারও জানা ছিল না; থাকিলে গুলবদনকে তিনি 'আকবরের বেগম' বলিয়া অনুমান করিতেন না! (*Ain-i-Akbari*, i. 48.)

হুমায়ূন-নামার ফার্সী পুঁথিখানি ১৮৬৮ খ্রীষ্টাব্দে কর্ণেল জর্জ্জ উইলিয়াম্ হ্যামিল্‌টনের বিধবার নিকট হইতে ক্রয় করা হয়। সেই অবধি ইহা ব্রিটিশ মিউজিয়মে স্থান পাইয়াছে। বাখরগঞ্জের ইতিহাস-প্রণেতা সুপ্রসিদ্ধ বেভারিজ সাহেবের বিদুষী পত্নী ইহার ইংরাজী অনুবাদ প্রকাশ করিয়া আমাদের ধন্যবাদভাজন হইয়াছেন।

'আকবর-নামা' আবুল-ফজলের রচিত বাদশাহ্ আকবরের রাজত্বকালের সুবৃহৎ সরকারী ইতিহাস। এই গ্রন্থের উপাদান সংগ্রহ করিয়া দিবার জন্য বাদশাহ্ এক হুকুম জারি করেন। ইহার ফলে, হুমায়ূনের আফ্‌তাব্‌চী (পানপাত্রবাহক) জৌহর, এবং আকবরের বকাওলবেগী (রাজরন্ধনশালার পরিদর্শক) বায়াজীদ্ বীয়াতের স্মৃতিকথা রচিত হয়। বাদশাহ্ আক্‌বরের

এই আদেশ-প্রচারের কথা আবুল-ফজল্ তাঁহার গ্রন্থে উল্লেখ করিয়াছেন। (*Akbarnama*, i. 29, 30, 33). খুব সম্ভব, এই রাজাদেশের ফলেই গুলবদন্ 'হুমায়ূন-নামা' রচনা করেন ; কারণ তিনিও লিখিয়াছেন,—"বাদশাহ্ আকবর আদেশ প্রচার করেন—বাবর ও হুমায়ূনের সম্বন্ধে যাহা জান, লিপিবদ্ধ কর।" এ অনুমান সত্য হইলে দেখা যাইতেছে, 'হুমায়ূন-নামা' রচনার তারিখ ১৫৮৭ খ্রীষ্টাব্দের (৯৯৫ হিঃ) কাছাকাছি। আবুল-ফজল্ কিন্তু হুমায়ূন-নামা সম্বন্ধে নীরব। তবে তিনি যে আকবরনামা-রচনাকালে গুলবদনের পুঁথির সাহায্য লইয়াছিলেন, তাহার প্রমাণ আছে। *

হুমায়ূন-নামা সাহিত্য হিসাবে রচিত হয় নাই ;— আবুল-ফজলের আকবর-নামার উপকরণ হিসাবে লিখিত। সাম্রাজ্য বা রাজদরবারের যে সমস্ত ঘটনা গুলবদন্ জানিতেন, বা বিশ্বস্তসূত্রে অবগত হন, তাহাই অকপটে চলিত কথায় লিখিয়া গিয়াছেন। তাঁহার রচনা সরল, সুন্দর,—লেখায় একটা স্বচ্ছন্দ গতির পরিচয় পাওয়া যায়। মাঝে মাঝে তুর্কী শব্দের প্রয়োগ আছে। ইহা খুবই স্বাভাবিক ; কারণ গুলবদন ও তাঁহার স্বামীর মাতৃভাষাই ছিল তুর্কী। তাঁহার ফার্সী-জ্ঞান অধ্যয়নলব্ধ মাত্র।

---

* "A passage about Babar (*Bib. Ind.*, edit. I. 87) closely resembles the begam's on the same topic; and a divergence, noted by Mr. Erskine (Mems., 218*n*) as made from Babar's narrative by Abul-fazal, is made also by the begam."—*Humayun-Nama*, p. 78*n*.

হুমায়ূন্-নামা

হুমায়ূন-নামার প্রথমাংশে বাবরের কথা। ইহার অধিকাংশই বাবর বাদশাহের আত্মকথা হইতে গৃহীত। পিতার মৃত্যুকালে গুলবদনের বয়স মাত্র আট বৎসর, সুতরাং তাঁহার নিকট হইতে বাবরের রাজত্বকালের চাক্ষুষ বিবরণ জানিবার আশা করা যায় না।

ইতিহাসের দিক্ হইতে হুমায়ূন্-নামার একটা বিশেষ সার্থকতা আছে। ইহা আবিষ্কৃত না হইলে বোধ হয় বাবরের পুত্রকন্যা, আত্মীয়স্বজন ও সে যুগের কয়েকটি পরিবারের সঠিক বৃত্তান্ত আমাদের নিকট অজ্ঞাত থাকিয়া যাইত। বাবর ও হুমায়ূনের জীবনী-লেখক আরস্কিন্ (Erskine) সাহেবেরও হুমায়ূন-নামা দৃষ্টিগোচর হয় নাই। ইহার সাহায্য পাইলে তাঁহার গ্রন্থে বর্ণিত বাবর ও হুমায়ূনের পরিবারবর্গের কাহিনী অধিকতর সম্পূর্ণতা লাভ করিত। হুমায়ূন্-নামা আকবরের বাল্যজীবনের ইতিহাসের উপরও বিশেষ আলোকপাত করে।

নিজের অখ্যাতি দোষত্রুটি গোপন করাই মনুষ্য-চরিত্রের পক্ষে স্বাভাবিক। শাহ্ ইসমাইলের অধীনতা-স্বীকার, ঘাজ্‌দওয়ানের পরাজয়, আলাম্ লোদীর (সুলতান আলাউদ্দীনের) প্রতি অন্যায় আচরণ,—এ সব কথা বাবর তাঁহার আত্মকাহিনী 'তুজুক-ই-বাবুরী'তে গোপন করিয়াছেন। জহাঙ্গীরও পিতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ও শের আফ্‌কনের মৃত্যুর কারণ আত্মকাহিনীতে যথাযথ উল্লেখ করেন নাই। এমন কি স্নেহময়ী গুল্‌বদনও স্নেহের আতিশয্যে সহোদর হিন্দাল, ও বৈমাত্রেয় ভ্রাতা হুমায়ূনের দোষত্রুটি ঢাকিবার

চেষ্টা করিয়াছেন। তাঁহার গ্রন্থের তারিখগুলিও সাবধানে গ্রহণ করা উচিত।

দুঃখের বিষয়, ব্রিটিশ মিউজিয়মে রক্ষিত হুমায়ূন্-নামার এই পুঁথিখানি অসম্পূর্ণ—শেষের কয়েক পৃষ্ঠা হারাইয়া গিয়াছে। হুমায়ুনের ভারত-বিজয়ের পূর্ব্বাবধি—মীর্জ্জা কামরান্‌কে অন্ধ করিয়া দেওয়া পর্য্যন্ত—এই খণ্ডিত পুঁথির শেষ সীমা। বায়াজীদ্ বীয়াতের স্মৃতিকথা—তারিখ্-ই-হুমায়ূন্—সম্পূর্ণ হইলে তাহার নয়খানি পুঁথি নকল করা হয়। দুইখানি বাদশাহের পাঠাগারে, সলীম্ মুরাদ ও দানিয়াল্—তিন কুমারকে তিনখানি, গুলবদনের পাঠাগারে একখানি, এবং দুইখানি আবুল-ফজলকে দেওয়া হয়; বাকি এক-খানি সম্ভবতঃ গ্রন্থকার নিজে রাখিয়াছিলেন। গুলবদনের হুমায়ূন্-নামাও একই উদ্দেশ্যে রাজাদেশে রচিত হয়, এবং বায়াজীদের পুঁথির মত, ইহারও যে একাধিক পুঁথি নকল হইয়াছিল, এরূপ অনুমান অসঙ্গত নহে। কিন্তু ব্রিটিশ মিউজিয়মে রক্ষিত পুঁথিখানি ছাড়া গুলবদনের গ্রন্থের দ্বিতীয় পুঁথি অদ্যাবধি আবিষ্কৃত হয় নাই।

শাহ্‌জাদী জেব্‌-উন্নিসা

(দিল্লী মিউজিয়মে রক্ষিত প্রাচীন চিত্র হইতে)

জেব-উন্নিসা

কবি গাহিয়াছেন ঃ—

The paths of glory lead but to the grave.

নরগরিমার শেষ—শ্মশান-সৈকত। এ কথার জলন্ত সাক্ষী—মোগল-মহিমার মহাশ্মশান ঐ দিল্লী, ঐ আগ্রা! সবই গিয়াছে,—আছে শুধু হৃদয়-মনোমোহন স্মৃতি! এই দিল্লী আগ্রার বাদ্‌শাহী-উদ্যান, একদিন একটি অতুলনীয় সুষমাময়ী প্রসূনের সুবাসে আমোদিত হইয়াছিল,—যাহার পবিত্র সুরভি এখনও তেমনই স্নিগ্ধ, তেমনই মনোমদ। সেই পবিত্র কুসুম—'রমণীরত্ন', শাহানশাহ্‌ আওরংজীব-দুহিতা—জেব্ উন্নিসা!

মোগল-সম্রাট্ আওরংজীবের জ্যেষ্ঠা কন্যার নাম জেব্-উন্নিসা। তিনি দিলরস্ বানু বেগমের গর্ভে, ১৬৩৮ খ্রীষ্টাব্দের ১৫ই ফেব্রুয়ারী দক্ষিণাপথের দৌলতাবাদে জন্মগ্রহণ করেন। হাফিজা মরিয়ম্ নামে জনৈক বিদুষী মহিলার উপর জেবের শৈশব-শিক্ষার ভার অর্পিত হয়। অল্প বয়স হইতেই তাঁহার জ্ঞানার্জ্জন-স্পৃহা অতীব বলবতী ছিল। সেকালের প্রথানুসারে তিনি কোরাণ কণ্ঠস্থ করেন। একদিন পিতার নিকট সমস্ত কোরাণ আমূল আবৃত্তি করিয়া সকলকে বিস্ময়াবিষ্ট করিয়াছিলেন। কন্যার অনন্যসাধারণ স্মরণশক্তি-দর্শনে মুগ্ধ হইয়া, আওরংজীব বালিকাকে ৩০ হাজার আশরফি পারিতোষিক প্রদান করেন। বলা বাহুল্য,

জেব্-উন্নিসা এই শিক্ষার সুফল সম্পূর্ণভাবে আয়ত্ত করিতে কিছুমাত্র আলস্য করেন নাই। নস্তালিক্, নস্‌খ ও শিকাস্তা—এই তিন ছাঁদেই তাঁহার হাতের ফার্সী অক্ষর সুন্দর হইয়া উঠিয়াছিল। আর্বী ও ফার্সী উভয় ভাষাতেই তাঁহার যথেষ্ট অধিকার জন্মিয়াছিল। আরবীয় ধর্ম্মতত্ত্বে তিনি ব্যুৎপন্ন ছিলেন। বাদশাহ্ তাঁহার এই বিদুষী ধর্ম্মানুরাগিণী কন্যাটিকে অত্যন্ত স্নেহ করিতেন। অনেক সময় জেবের সহিত তাঁহার ধর্ম্মশাস্ত্রের আলোচনা হইত। ঐ আলোচনা কিরূপ, তাহা জেব্-উন্নিসাকে লিখিত, আওরংজীবের একখানি পত্রপাঠে অবগত হওয়া যায়। পত্রখানির কিয়দংশ আর্বী ও কিয়দংশ ফার্সীতে লিখিত। 'ফয়াজ্-উল্-কওয়ানীন্' পুঁথির ৩৬৯ পৃষ্ঠায় ইহার যে নকল দেওয়া হইয়াছে, তাহার মর্ম্মানুবাদ এইরূপ।—

"ভগবান্‌কে বন্দনা করিয়া ও প্রেরিত-পুরুষকে প্রণিপাত করিয়া (লিখিতেছি)।—খোদার আশীর্ব্বাদ তোমার উপর বর্ষিত হউক। পুণ্য মাস রমজান্ আসিয়াছে। পরমেশ্বর তোমার উপর উপবাসরূপ কর্ত্তব্যের ভার অর্পণ করিয়াছেন। এই মাসে স্বর্গদ্বার উদ্‌ঘাটিত ও নরকদ্বার রুদ্ধ হয়, বিপ্লবকারী শয়তানেরা কারানিবদ্ধ থাকে। রমজানের ধর্ম্মনিয়মাদি প্রতিপালনের জন্য আমরা উভয়েই যেন ভগবানের আশীর্ব্বাদ লাভ করিতে সমর্থ হই।

"বৎসে! তোমার ও আমার মধ্যে যে পত্র-ব্যবহার হয়, তাহাতে যেন আমাদের আধ্যাত্মিক কল্যাণ সাধিত হইতে পারে।

ঐহিক সুখরাশির নেশায় প্রমত্ত মূঢ় মানবের ন্যায় আর
কতকাল আমরা পারত্রিক-ব্যাপারে উদাসীন হইয়া,
ভগবানের সঙ্গ হইতে দূরে থাকিব ?

"একমাত্র ভগবদনুগ্রহই আমাকে সুপথে পরিচালিত করিবার
প্রেরণা দান করিতে পারে। সেই প্রকৃত মহান্ ঈশ্বর
বলিয়াছেন,—আমি জীবন ও মৃত্যুর সৃষ্টি করিয়াছি।"

যাঁহার প্রভাব, প্রতিপত্তি ও ঐশ্বর্য্যের তুলনা নাই, জেব্-উন্নিসা সেই মহাভাগ্যবান্ ভারতেশ্বরের আদরিণী কন্যা,—ইচ্ছা করিলে যে-কোনরূপ বিলাসব্যসনে আমরণ নিমগ্ন থাকিতে পারিতেন। কিন্তু এই বিদুষী বাদশাহ্-দুহিতা সে সকলকে একান্ত অকিঞ্চিৎকর মনে করিয়া, জ্ঞানানুশীলন ও সাহিত্যচর্চ্চাকেই তাঁহার পুণ্যময় জীবনের ব্রতরূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন। বহু মূল্যবান্ দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থ তাঁহার পুস্তকাগারের গৌরব বৃদ্ধি করিত। এরূপ উচ্চাঙ্গের পুস্তকাগার তখনকার দিনে খুব কমই ছিল। পুস্তকাগারে সংগৃহীত ধর্ম্ম ও সাহিত্য-সম্বন্ধীয় বহু গ্রন্থ তাঁহার জ্ঞানার্জ্জন-স্পৃহা ও পবিত্র জীবনযাপনের সাক্ষ্যস্বরূপ বিদ্যমান ছিল। আবার এই সাহিত্যচর্চ্চা শুধু যে তাঁহার নিজের মধ্যেই নিবদ্ধ ছিল, এমন নহে; তিনি নিজেও যেমন সাহিত্যানুরাগিণী, সাহিত্যিকগণের সাহিত্যানুরাগেরও তেমনই উৎসাহদাত্রী। বহু দুঃস্থ গুণী লেখক তাঁহার নিকট সাহায্য পাইয়া সাহিত্য-সেবার সুযোগলাভ করিতেন। সাহিত্যের উন্নতিকল্পে জেব্ অনেক সুপণ্ডিত মৌলবীকে যোগ্য বেতনে নূতন পুস্তক-প্রণয়ণের জন্য,

অথবা তাঁহার নিজের ব্যবহারার্থ দুষ্প্রাপ্য হস্তলিখিত পুঁথির নকল-কার্য্যের জন্য নিযুক্ত করিয়াছিলেন। যে-সকল লেখক তাঁহার যত্ন ও চেষ্টায় যশস্বী হন, তন্মধ্যে মুল্লা সফী-উদ্দীন্ অর্দ্দবেলীর নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। সাহিত্যচর্চ্চার সুবিধার জন্য, সফী-উদ্দীন্ জেবের অর্থে আরামে কাশ্মীর-বাস করিতেন। তিনি 'জেব্-উৎ-তফাসির' নাম দিয়া কোরাণের আর্বী মহাভাষ্য ফার্সীতে অনুবাদ' করেন। সফী-উদ্দীন গ্রন্থখানি জেব্-উন্নিসার নামে প্রচার করিয়াছিলেন। এইরূপ আরও কয়েকখানি গ্রন্থ জেবের নামে প্রচলিত; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তিনি নিজে ঐ সকল গ্রন্থ রচনা করেন নাই। লেখকগণ কৃতজ্ঞতা-প্রকাশের জন্য তাঁহার নাম ঐ সকল গ্রন্থে নিবদ্ধ করিয়াছিলেন।

প্রকৃতি জেব্-উন্নিসাকে সৌন্দর্য্যের ললামভূতা করিয়া সৃষ্টি করিয়াছিলেন। বাহিরের রূপ, আর অন্তরের পাণ্ডিত্য ও কবিত্ব-প্রতিভা তাঁহার অসামান্য গৌরবের কারণ হইয়াছিল। মোগলের নিভৃত ঘনঘোর অন্তঃপুরে পর্দ্দার অন্তরালে বাস করিয়াও জেব্, পত্রাচ্ছাদিত, সুরভি-সৌন্দর্য্য-মণ্ডিত গোলাপ পুষ্পের ন্যায় আপনাকে ক্ষুদ্র গণ্ডীর মধ্যে লুক্কায়িত রাখিতে পারেন নাই—দেশদেশান্তরে তাঁহার যশ পরিব্যাপ্ত হইয়াছিল।

কিন্তু বাদ্শাহী-অন্তপুরের নিভৃত মালঞ্চে, বাদ্শাহ্জাদীর মানস-লতিকায় যে-সকল কবিতাগুচ্ছের বিকাশ হইয়াছিল, আজ তাহা কোথায়? তাহার অধিকাংশই বিজনবনের ফুলের মত, লোকচক্ষুর অন্তরালে ফুটিয়া উঠিয়া ঝরিয়া পড়িয়াছে। ইতিহাসের

পৃষ্ঠায় তাহার ক্ষীণ গন্ধটুকু আছে, পরিচয়ের ছিন্ন সূত্রটুকু কোথায় হারাইয়া গিয়াছে—খুঁজিয়া বাহির করিবার উপায় নাই। 'দিউয়ান্-ই-মখ্ফী'তে তাঁহার রচিত অনেক কবিতা স্থান পাইয়াছিল সত্য; কিন্তু সে কোন্ 'মখ্ফী'? যে-সমস্ত কবি গুপ্তভাবে কবিতা-রচনা ও প্রচার করেন, ফার্সীতে তাঁহাদের ছদ্মনাম 'মখ্ফী'। ফার্সী ভাষায় মখ্ফী এক নহে—বহু। বাদশাহ্জাদীর হৃদয়ের অতুলনীয় ভাব-সম্পদ্ কোন্ মখ্ফীর সৃষ্টিপুষ্টি করিয়াছিল, তাহা আজ কে নিশ্চয় করিয়া বলিবে?

সম্রাট্ আওরংজীব কবিতার পক্ষপাতী ছিলেন না। কবিদিগকে তিনি মিথ্যাবাদী চাটুকার, আর তাঁহাদের রচনাকে জলবুদ্বুদের মত ব্যর্থ বলিয়া ঘৃণা প্রকাশ করিতেন। কোন কবিই তাঁহার দরবারে রাজ-অনুগ্রহ লাভ করিতে পারেন নাই। কিন্তু করুণারূপিণী জেবের করুণা হইতে যে অনেকেই বঞ্চিত হন নাই, তাহা বলা বাহুল্য। কন্যার করুণার ফল্গুধারা, আওরংজীবের আমলের সাহিত্যকে এইরূপে সঞ্জীবিত রাখিয়া ধন্য হইয়াছিল।

দুঃখের বিষয়, ইতিহাসের নামে কোন কোন উর্ব্বরমস্তিষ্ক কল্পনাজীবি লেখক, এই বিদ্যাচর্চ্চা-নিরতা, নিষ্ঠাবতী, আজীবন-কুমারী, নির্ম্মলস্বভাবা জেব্-উন্নিসাকে, অসম্ভব কাল্পনিক কাহিনীর নায়িকারূপে চিত্রিত করিয়া জনসাধারণের মনোরঞ্জনের প্রয়াস পাইয়াছেন। গল্পের উৎকৃষ্ট পাত্রী বাদ্শাহী হারেমের কুমারী-কন্যার মত আর কি হইতে পারে? এরূপ চরিত্র-সম্বন্ধে যে অতি সহজেই সাধারণের শ্রুতিমধুর অবৈধ-প্রেমের অপরূপ কাহিনী সৃষ্ট

হইতে পারে! তাহার উপর জেব্-উন্নিসা শুধু আজীবন-কুমারী নহেন;—বিদুষী, কবি এবং অসামান্য সৌন্দর্য্য-সম্পদ্শালিনী; অতএব কল্পনাজীবিরা শাহ্জাদী সম্বন্ধে গল্পরচনার সুযোগ কিরূপে পরিত্যাগ করিবেন? বড়ই দুঃখের বিষয়, তাঁহাদের অবাধ-কল্পনার ঘৃণিত তুলিকায়, জেব্-উন্নিসার অকলঙ্ক নির্ম্মল মূর্ত্তি ঘোর মসীবর্ণে চিত্রিত হইয়াছে।

জেব্-উন্নিসা ভ্রাতা মুহম্মদ্ আক্বরকে নিরতিশয় স্নেহচক্ষে দেখিতেন। জ্যেষ্ঠা ভগিনীর প্রতি আক্বরেরও অগাধ বিশ্বাস, অপরিসীম শ্রদ্ধাভক্তি ছিল। আক্বর একখানি পত্রে জেব্কে লিখিয়াছেন,—

"যাহা তোমার, তাহাই আমার; এবং যাহা আমার তাহাতে সর্ব্বসময়ে তোমার অধিকার রহিয়াছে। * * * —দৌলৎ ও সাগরমলের জামাতাদিগকে কার্য্যে নিয়োগ বা কর্ম্মচ্যুত করা, তোমার ইচ্ছাধীন। তোমারই আদেশে আমি তাহাদিগকে কর্ম্মচ্যুত করিয়াছি। সমস্ত বিষয়েই তোমার আদেশ, আমি কোরাণ ও প্রেরিত-পুরুষের 'হদীসের' ন্যায় পবিত্র মনে করিয়া অবশ্যকর্ত্তব্যবোধে প্রতিপালন করি।"

ভগিনীর কিরূপ স্নেহ ও আন্তরিকতার জন্য আক্বর তাঁহাকে এত শ্রদ্ধা, এত নির্ভর করিতেন, তাহা সহজেই অনুমেয়। এই অকৃত্রিম ভ্রাতৃস্নেহই জেবের কালস্বরূপ হইয়াছিল।

আক্বর পিতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হইলেন; কিন্তু রাজসৈন্যের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতায় কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন না; আজ্মীরের

নিকট তাঁহার যে শিবির-সন্নিবেশ হইয়াছিল, তাহা পরিত্যাগ করিয়া তাঁহাকে পলায়ন করিতে হইল। "বিদ্রোহের অব্যবহিতপূর্ব্বে, ভ্রাতা আক্‌বরকে জেব্-উন্নিসা যে-সকল গুপ্ত চিঠিপত্র লিখিয়াছিলেন, রাজসৈন্য শিবির অধিকার করিলে (১৬ই জানুয়ারী, ১৬৮১) তৎসমুদয় সম্রাটের করগত হইল। অপরাধী পুত্র তাঁহার হস্তচ্যুত, সুতরাং বিদ্রোহীর সহিত ষড়্‌যন্ত্রে লিপ্ত থাকার অপরাধে, আওরংজীবের সমস্ত ক্রোধ পতিত হইল—জেব্-উন্নিসার উপর। ক্রোধান্ধ বাদশাহ্ কন্যার সমস্ত সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত * ও বার্ষিক চারি লক্ষ টাকা বৃত্তি বন্ধ করিয়া তাঁহাকে আমরণকালের জন্য (১৬৮১—১৭০২) দিল্লীর সলীম্‌গড়ে বন্দী করিলেন।" †

তাহার পর সুদীর্ঘ দ্বাবিংশতিবর্ষ স্নেহময়ী কুসুমকোমলা জেব্-উন্নিসাকে ঐস্থানে বন্দিনীর কঠোর জীবন যাপন করিতে হয়। কারাপ্রাচীরের আবেষ্টনের মধ্যে নিঃসঙ্গ বন্দী-দশায় তখন তাঁহার

---

* এই বাজেয়াপ্ত সম্পত্তির পরিমাণ, 'দস্তুর-উল্-আমল্' পুঁথি (*f.* 94 *b*) অনুসারে ৬৩ মোহর, ৫৬৬৮৬৬ টাকা। কিন্তু 'জওয়াবিৎ-ই-আলম্‌গীরি' (*f.* 70 *a*) পুঁথির মতে ৭৩ মোহর, ৫৭৩৭৬৩ টাকা।

'আলম্‌গীর-নামা' গ্রন্থ-পাঠে (পৃঃ ৮৩৬) জানা যায়, কাশ্মীরে জেব্-উন্নিসার একটি পরগণা ছিল। পরগণাটি জলপ্রপাতযুক্ত—নাম 'বেগমাবাদ' ওরফে 'আচবল্'। এখানের জল ও দৃশ্য দুই-ই সুন্দর। পরগণাটিতে বাদশাহী প্রাসাদ ও উদ্যান ছিল।

† *Masir-i-Alamgiri*, p. 204.

কবিচিত্তে বেদনাভরা কত ভাবের উদয় হইত, কত বিষাদগীতি মুকুলিত হইয়া ঝরিয়া পড়িত, তাহার ইয়ত্তা কে করিবে? মনে হয়, ঐ সময়েই তিনি খেদ করিয়া গাহিয়াছিলেন—

কঠিন নিগড়ে বদ্ধ, যতদিন চরণ-যুগল,
বন্ধু সবে বৈরী তোর, আর পর আত্মীয়-সকল।
সুনাম রাখিতে তুই করিবি কিঁ, সব হবে মিছে,
অপমান করিবারে বন্ধু যে গো ফেরে পিছে পিছে।
এ বিষাদ-কারা হ'তে মুক্তি-তরে বৃথা চেষ্টা তোর,
ওরে মখ্‌ফী, রাজচক্রে নিদারুণ, বিরূপ কঠোর;
জেনে রাখ্‌ বন্দী তুই, শেষ দিন না আসিলে আর,
নাই নাই, আশা নাই, খুলিবে না লৌহ-কারাগার।

লৌহদ্বার সত্য সত্যই মুক্ত হয় নাই—হইয়াছিল একদিন, যেদিন মৃত্যুর ভবভয়হারী মহাবল আনন্দময় বাহু জেব্‌-উন্নিসাকে শান্তিপ্রদ মুক্তিরাজ্যে লইয়া যাইবার জন্য প্রসারিত হয় (২৬শে মে, ১৭০২)। বাদ্‌শাহের সমগ্র রাজ্য সেদিন শোকভারাক্রান্ত হইয়াছিল,—আর যে বাদ্‌শাহ্‌ এতদিন স্বার্থের অমানুষী মায়া ও রাজনীতির কুটিলচক্রে অপত্য-স্নেহ ভুলিয়াছিলেন, তিনিও শোকাবেগ সংবরণ করিতে পারেন নাই; প্রিয়কন্যার মৃত্যু-সংবাদ-শ্রবণে বৃদ্ধ আওরংজীবের পাষাণ চক্ষু ফাটিয়াও অশ্রুধারা বহিয়াছিল!

সম্রাটের দারুণ ক্রোধবশে একটি অমূল্য জীবন অনাদৃতভাবে কারা-প্রাচীরমধ্যে অতিবাহিত হইয়াছিল। এই সুদীর্ঘকাল কর্ম্মক্ষেত্রে বিচরণ করিতে পারিলে জেব্‌-উন্নিসার জীবন-কাহিনী

যে আরও কত সুন্দর হইত,—তাঁহার দীপ্ত প্রতিভা যে আরও কত সৌন্দর্য্যের বিকাশ-সাধন করিত, তাহা কে বলিতে পারে? যাঁহার জীবনের বিশিষ্ট সময়ই কঠোর কারাবাসে অতিবাহিত হইয়াছে, তাঁহার ইতিহাস আর কেমন করিয়া ঘটনাবহুল হইবে? কিন্তু যে অত্যল্পকাল তিনি স্বীয় প্রতিভা-বিকাশের অবসর পাইয়াছিলেন, তাহা হৃদয়বান্ ব্যক্তিগণ অতুল সম্পদ্ বলিয়া সাদরে বরণ করিয়া লইবেন, সন্দেহ নাই।

বাদ্‌শাহ্‌জাদীর অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার যে কোনরূপ ত্রুটি হয় নাই, তাহা বলা বাহুল্য। এই উপলক্ষে সম্রাট্, কন্যার পরলোকগত-আত্মার শান্তিবিধানের জন্য সৈয়দ আম্‌জাদ্ খাঁ, শেখ্ আতাউল্লা, এবং হাফিজ্ খাঁকে বহু মুদ্রা দান-খয়রাৎ করিতে আদেশ করেন। দিল্লীর কাবুলী-তোরণের বহির্ভাগে, জহান্-আরা-প্রদত্ত, 'তিশ্-হাজারী' উদ্যানে জেবুকে সমাহিত করা হয়। (*M. A.*, 462). কিন্তু এখন আর সে সমাধি-ভবনের অস্তিত্ব নাই,—রাজপুতানা-মাল্‌ওয়া রেলপথ-নির্ম্মাণকালে তাহা বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে।

'দিউয়ান্-ই-মখ্ফী' কি জেব-উন্নিসার ?

সেকালের রীতি অনুসারে মোগল-অন্তঃপুরচারিণীরা কবিতাদি রচনা করিতেন। কেবল জেব্-উন্নিসা কেন,—আক্‌বর-মহিষী সলীমা সুলতান্ বেগম ও সম্রাজ্ঞী নূরজহান্‌ও 'মখ্ফী' (গুপ্তব্যক্তি) ভণিতায় অনেক ফার্সী কবিতা রচনা করিয়াছিলেন। বর্ত্তমানে যে 'দিউয়ান্-ই-মখ্ফী' জেব্-উন্নিসার রচনা বলিয়া সাধারণতঃ আমাদের নিকট পরিচিত, তাহা প্রকৃতপক্ষে জেবের রচনা কি না, সে বিষয়ে সন্দেহ আছে।

স্প্রেঙ্গার সাহেব এবং ডাক্তার রিউ * উভয়েই বলেন, দিউয়ান্-ই-মখ্ফী জেব-উন্নিসার লেখনী-প্রসূত। কিন্তু দিউয়ান্ পাঠ করিলে, একজন রাজপরিবারভুক্ত মহিলার নিকট হইতে এরূপ লিখনভঙ্গী ও বক্তব্য-বিষয় প্রকাশ করিবার পদ্ধতি যে কখনও আশা করা যায় না—সে কথা আপনা হইতেই মনে আসে। অধিকন্তু দিউয়ানে এমন কতকগুলি কবিতা স্থান পাইয়াছে, যাহা পাঠ করিলে স্প্রেঙ্গার ও রিউ সাহেবের মতের সমীচীনতা সম্বন্ধে যথেষ্ট সন্দেহ হয়। দিউয়ান্-ই-মখ্ফীর অনেকস্থলে দেখা যায়, গ্রন্থকারের জন্ম খুরাসানে। তিনি তখন ভারতবর্ষে অবস্থান করিতেছিলেন মাত্র। ভারতবর্ষের উপর তাঁহার যে খুব কমই আকর্ষণ ছিল, তাহা এই কবিতাটিতে ফুটিয়া উঠিয়াছে—

* *Oudh Nawab's Catalogue*—Sprenger, p. 480. *Cat. of Pers. MSS. in the British Museum*, by Dr. Rieu, ii. 702.

দিল্ আশুফ্তা-ই-মখ্ফী বফন্-ই-খুদ্ আরস্ত ইস্ত্।
বহিন্দ উফ্তাদা আস্ত, আম্মা খুরাসানস্ত্ ইউনানশ্॥
দরী কিশ্ওর্ জবুনীহাএ তালা নাকিসশ্ দারদ্।
ও গর্ না দর্ হুনর্মন্দী নবাশদ্ হীচ্ নুকসানশ্॥

মখ্ফীর উন্মত্ত হৃদয় নিজ বিদ্যায় স্বয়ং এরিষ্টটল্। (যদিও) সে হিন্দুস্থানে আসিয়া পড়িয়াছে (কিন্তু) খুরাসান্ তাহার পক্ষে গ্রীস। এই দেশে তাহার মন্দভাগ্য অনেক হীনতা (ক্ষতি) আনিয়া দিয়াছে। তাহা না হইলে, তাহার বুদ্ধির (ত) কোনই হ্রাস হয় নাই॥

অন্যত্র,—

বুআলী-এ-রোজগারম্ আজ্ খুরাসান্ আমদা।
আজ্ পায়্ এজাজ্ বর্ দরগাহ্-ই-সুলতান্ আমদা॥
হয়রতে দারম্ কে চুঁ ইয়া রব্ দরীঁ জুলমাৎ-ই-হিন্দ্।
তুতী এ ফিকরম্ পায়্-শকর্ জে রিজওয়ান্ আমদা॥

আমি বর্ত্তমান যুগের Avicenna (মহাপণ্ডিত),—খুরাসান হইতে আগত। ভক্তির চরণে সম্রাটের সভায় আসিয়াছি। হে ভগবান্! ভাবিয়া আশ্চর্য্য হই, কেন মিছরী খণ্ডের মিষ্টতায় আকৃষ্ট শুকপাখীর মত আমার বুদ্ধি হিন্দুস্থানের এই গাঢ় তিমিরে আসিয়াছে।

সম্রাট্ শাহ্জহানের দরবারে প্রবেশ করিতে না পারায় গ্রন্থকার দুঃখে বলিতেছেন—

বর্ দর্-ই-সুলতান্-ই-আসর্ হএফ্ নাদারম্ কসে।
তা কে রসানদ্ বআর্জ-ই-মকসদ্ আর্কানে-উ।
সানি সাহিব্-ই-কিরাণ পাদিশাহে-ইন্স্ ও জান্।
আঁকে মুল্ক্ সর্ নেহদ্ বর্ খৎ ই ফর্মানে-উ॥

কি দুঃখ! এই যুগের সম্রাটের দরবারে আমার কেহ (বন্ধু) নাই। যে (আমার) প্রার্থনা তাঁহার শ্রুতিগোচর করিবে। দ্বিতীয় সাহিব্-ই-কিরাণ (= শাহ্জহান্) নরজাতি এবং জিনের সম্রাট্। যাঁহার আজ্ঞাপত্রের উপর জগৎ (ভক্তিভরে) মস্তক অবনত করে।

ইহা হইতে স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে, আলোচ্য দিউয়ান্-ই-মখ্ফীর লেখক ও জেব্ উন্নিসা একই ব্যক্তি নহেন। দিউয়ানের লেখক সম্রাট্ শাহ্জহানের দরবারে প্রবেশলাভে অসমর্থ হইয়া আক্ষেপ করিতেছেন। তিনি কখনও জেব্-উন্নিসা হইতে পারেন না। পিতামহ শাহ্জহানের দরবারে তাঁহার দৌহিত্রী জেব্-উন্নিসার অবারিতদ্বার। এ ছাড়া আরও জানা যায় যে, 'দিউয়ান্'-লেখকের জন্মভূমি—খুরাসান; কিন্তু জেবের জন্মস্থান—দৌলতাবাদ!

দিউয়ান্-ই-মখ্ফীর শেষভাগের কতকগুলি কবিতা হইতে স্পষ্টই বুঝা যায়, গ্রন্থকার প্রেরিত-পুরুষ মুহম্মদের সমাধি দর্শন করিতে গিয়া, সেখানে ঐ কবিতাগুলি পাঠ করিয়াছিলেন।

সকলেই একবাক্যে স্বীকার করিয়াছেন, কবিতা-রচনায় বিদুষী জেব্-উন্নিসার যথেষ্ট পারদর্শিতা ছিল; এবং কোন কোন

লেখকের মতে তিনি একখানি দিউয়ানেরও রচয়িত্রী। বোধ হয়, এই কারণেই বর্ত্তমান দিউয়ান্-ই-মখ্ফীকেই অনেকে জেব্-উন্নিসার রচনা বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। এই দিউয়ান্-ই-মখ্ফীর কোন কোনখানিতে আবার এমন কতকগুলি কবিতা সন্নিবিষ্ট হইয়াছে, যাহা জেবের কবিতা বলিয়াই সাধারণতঃ লোকের ধারণা। কলিকাতার এঁসিয়াটিক্ সোসাইটিতে ডাঃ রসের (Dr. Ross) সংগৃহীত, দিউয়ান্-ই-মখ্ফীর একখানি পুঁথি আছে। ইহাতে জেবের রচনা বলিয়া পরিচিত কতকগুলি কবিতা স্থানলাভ করিয়াছে ; তাহার একটি এইরূপ :—

বেশেকনদ্ দস্তে কে খম্ দর্ গর্দন্-ই-ইয়ারে নাশুদ্।
কুর্ বা-চশ্মে কে লজ্জৎগীর-ই-দীদারে নাশুদ্॥
সদ্ বহার্ আখির্ শুদ্ ও হর্ গুল্ বফর্কে জা গেরেফ্ৎ।
ঘুঞ্চা-এ-বাঘ্-ই-দিল্-ই-মা জেব্-ই-দস্তারে নাশুদ্॥

সে বাহু (ভগ্ন ছাড়া কিছুই নহে) যাহা প্রেমিকের কণ্ঠ বেষ্টন করে নাই। চক্ষু থাকিতেও অন্ধ যে (প্রেমাস্পদকে) দর্শনের রস আস্বাদন করে নাই। শত শত বসন্ত শেষ হইল, প্রতি ফুল মস্তকে স্থান পাইল। (কিন্তু) আমার হৃদয়-উদ্যানের কোরক কোন শিরস্ত্রাণের ভূষণ হইল না।

কথিত আছে, ইহার উত্তরে একব্যক্তি এই কবিতাটি রচনা করিয়াছিলেন :—

পীর্ শুদ্ জেব্-উন্-নিসা উ-রা খরিদারে নাশুদ্

অর্থাৎ—জেব্-উন্নিসা বৃদ্ধা হইল, কিন্তু তাহার ক্রেতা জুটিল না।

এখন জিজ্ঞাস্য, বর্ত্তমান-প্রচলিত দিউয়ান-ই-মখ্ফীর গ্রন্থকার তবে কে ? আমাদের মনে হয়, ইহার রচয়িতা গীলান্ প্রদেশের রশ্ট্ নগরের মখ্ফী,—জেব্-উন্নিসা নহেন। ইনি পারস্যের ফার্স প্রদেশের শাসনকর্ত্তা ইমাম্ কুলী খাঁর (মৃত্যু ১০৪৩ হিঃ = ১৬৩৩) কর্ম্মচারী—শাহ্জহানের আমলে (১৬২৮-১৬৫৭) ভারতে আসিয়াছিলেন। ১২৬৮ হিজ্রায় কানপুরে, এবং ১২৮৪ হিজ্রায় লক্ষ্ণৌ শহরে দিউয়ান-ই-মখ্ফী লিথোগ্রাফে মুদ্রিত হয়।

জেব্‌-উন্নিসা কি কলঙ্কিনী ?

চিরকুমারী, মনস্বিনী জেব্‌-উন্নিসার কলঙ্ক-কাহিনীর মূলে কোন সত্য নিহিত আছে কি না, বিচার করিয়া দেখা দরকার। তাঁহার সহিত আকিল্‌ খাঁ বা অন্য কাহারও অবৈধ প্রণয়ের কথা, আওরংজীবের আমলে রচিত কোন ইতিহাসে নাই ; তাঁহার মৃত্যুর অর্দ্ধশতাব্দী পরে লিখিত কোন ইতিহাসেও নাই। সরকারী ইতিহাসে বা রাজকর্ম্মচারী-লিখিত ইতিহাসে, রাজ-অন্তঃপুরের এরূপ কলঙ্ক-কথার স্থান হইতে পারে না ; কেন না, এই শ্রেণীর ইতিহাস হংসের ন্যায় সারগ্রাহী,—দোষভাগ পরিত্যাগ করিয়া গুণভাগ গ্রহণ না করিলে, তাহাদের উপায় নাই ; কিন্তু বে-সরকারী ইতিহাসের পক্ষে এ কথা খাটে না। সুতরাং আওরংজীবের আমলের বে-সরকারী ইতিহাসের সাক্ষ্য এস্থলে আমরা পরীক্ষা করিয়া অসঙ্কোচে গ্রহণ করিতে পারি। এই শ্রেণীর ঐতিহাসিকগণের মধ্যে ভীমসেন ও ঈশ্বরদাস নামক দুইজন হিন্দুর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এই দুই হিন্দু-ঐতিহাসিক মুসলমান রাজপরিবারের সম্বন্ধে রাখিয়া-ঢাকিয়া কোন কথা বলেন নাই—স্বাধীনভাবেই ফার্সী ভাষায় লেখনী পরিচালনা করিয়াছেন। কিন্তু জেব্‌-উন্নিসার প্রেম-কাহিনী-বর্ণনায় তাঁহাদের রচিত ইতিহাস নীরব। তারপর খাফী খাঁর কথা। তিনি আওরংজীবের মৃত্যুর ২৮ বৎসর পরে ইতিহাস প্রণয়ন করেন। ইঁহার নির্ভীক-লেখনী জহাঙ্গীর ও নূরজহানের লজ্জাজনক কাহিনীও অসঙ্কোচে উদ্‌গার

করিয়াছে, কিন্তু জেবের চরিত্রে বিন্দুমাত্র কলঙ্ক নিক্ষেপ করে নাই। তেমন কোন দোষের কথা থাকিলে যে খাফী খাঁর লেখনীর মুখে তাহা অপ্রকাশিত থাকিত না, ইহা নিঃসংশয়ে বলা যাইতে পারে।

আবার ইহারও এক পুরুষ পরে, মোগল-অভিজাতবর্গের জীবন-কাহিনী-সম্বলিত অভিধান 'মাসির্-উল্-উমারার' উৎপত্তি। এই অভিধানও জেব-উন্নিসার তথাকথিত কলঙ্ক-কাহিনী কীর্ত্তন করিয়া অপক্ষপাত ইতিহাসের মর্য্যাদা ক্ষুণ্ণ করে নাই। বলা বাহুল্য, খাফী খাঁর ন্যায়, এই সুবৃহৎ গ্রন্থের লেখকও স্বাধীন-ভাবে ইতিহাস-চর্চ্চা করিয়া গিয়াছেন। অবশিষ্ট রহিল, ইউরোপীয় পর্য্যটক বার্ণিয়ে (Bernier) ও মানুযীর (Manucci) ভ্রমণ-কাহিনী। বিদেশী পর্য্যটকদ্বয়,—বিদেশীর চক্ষু লইয়াই এ দেশের পরিচয় লইয়াছেন ; সেই দৃষ্টির মুখে এ দেশের ব্যাপার-সকল তাঁহাদের কাছে যেরূপ প্রতিভাত হইয়াছে, তাঁহারা সেইরূপই লিখিয়াছেন,—আওরংজীব বা তাঁহার বংশধরগণের ক্রোধভাজন হইবার ভয় তাঁহাদের ছিল না। তাঁহারা ভয় করিয়াও কোন কথা বলেন নাই ; বরং ইঁহাদের মধ্যে মানুযী, 'নিরঙ্কুশাঃ কবয়' পর্য্যায়ভুক্ত বলিলেও অত্যুক্তি হইবে না। মানুযীর রচিত মোগল-ইতিহাস *Storia do Mogor* রাজ্যসংক্রান্ত এত অধিক মিথ্যা কুৎসায় পূর্ণ যে বিজ্ঞ সমালোচকগণ ইহাকে *Chronique Scandaleuse* অর্থাৎ 'কলঙ্কের কেচ্ছা' নামে অভিহিত করিয়া কিছু অন্যায় করেন নাই। জেব্-উন্নিসা-চরিত্রে তিল পরিমাণ দোষ পাইলে যে, তিনি তাহাকে তাল পরিমাণ না

করিয়া ছাড়িতেন না, ইহা নিশ্চয়। তাঁহার কেচ্ছাতেও কিন্তু জেব্-উন্নিসার প্রণয়-কাহিনীর আভাসমাত্র নাই। এক কথায় ঐ প্রণয়-কাহিনী সত্য হইলে, উদ্ধৃত গ্রন্থনিচয়ের একখানিতেও অন্ততঃ তাহার উল্লেখ থাকিত। তাহা যখন নাই, তখন বুঝিতে হইবে উহা উর্ব্বর-মস্তিষ্কের কল্পনা-প্রসূত।

জেব্-উন্নিসার কলঙ্ক-কাহিনী ঊনবিংশ শতাব্দীর উর্দ্দূ-লেখকগণের কুকীর্ত্তি! আধুনিক উর্দ্দূ-গ্রন্থকারগণের আখ্যায়িকা ব্যতীত ইহার সন্ধান আর কোথাও পাইবার সম্ভাবনা নাই, এবং সম্ভবতঃ লক্ষ্ণৌ শহরেই ইহার সৃষ্টি। লাহোরের মুন্‌শী আহ্‌মদ্-উদ্দীন্, বি-এ মহাশয়ের 'তুর্‌র্-ই-মক্‌তুম্' নামে জেব্-উন্নিসার একখানি তথাকথিত জীবন-চরিত বর্ত্তমানে প্রচলিত। এই গ্রন্থেই আমরা জেবের কলঙ্ক-কাহিনীর কথা প্রথম দেখিতে পাই। গ্রন্থকার আবার এই পুস্তকের জন্য মুন্‌শী মুহম্মদ-উদ্দীন্ খালিকের 'হাইয়াৎ-ই-জেব্-উন্নিসা' নামক গ্রন্থ হইতে উপাদান সংগ্রহ করেন।

বিবি ওয়েষ্টব্রুক্ তাঁহার পুস্তকের ভূমিকায় (*Diwan of Zeb-un-Nisa*, pp. 14-17), জেবের প্রণয়-কাহিনীর এক সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিয়াছেন। কিন্তু উহা লেখিকার মৌলিক গবেষণার ফল নহে—স্পষ্টতঃ মুন্‌শী আহ্‌মদ্-উদ্দীনের উর্দ্দূ-গ্রন্থের চর্ব্বিতচর্ব্বণ! বিবরণটি এইরূপ :—

"১৬৬২ খ্রীষ্টাব্দের প্রারম্ভে আওরংজীব্ অসুস্থ হইয়া পড়েন। চিকিৎসকগণ বায়ু-পরিবর্ত্তনের পরামর্শ দেওয়ায় বাদ্‌শাহ্, পরিবার, পরিজন ও পারিষদ্‌বর্গসহ লাহোরে গমন করেন।

উজীর-পুত্র আকিল্ খাঁ তখন ঐস্থানের শাসনকর্ত্তা। তাঁহার যেমন রূপ, তেমনই বীরত্ব, আবার তেমনই কবিত্বের খ্যাতি। যোগ্যই যোগ্যের কদর বুঝে; আকিল্ জেব্-উন্নিসার রূপগুণের কথা শুনিয়া পূর্ব্বেই তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছিলেন; এইবার সেই সুদূরের বস্তু নিকটবর্ত্তী। আকিল্ স্থির থাকিতে পারিলেন না; নগর-রক্ষার ছলে অশ্বারোহণে রাজপ্রাসাদের চারিদিক পরিভ্রমণ করিতে লাগিলেন—উদ্দেশ্য যদি একবার জেবের সহিত সাক্ষাৎলাভের সুযোগ ঘটে। বলা বাহুল্য, সে সুযোগলাভেরও অধিক বিলম্ব হইল না। একদিন ঊষাকালে গুল্-আনার বর্ণের, অর্থাৎ ডালিম ফুলের রং-এর, বস্ত্রশোভিত বাদ্শাহ্-কন্যা প্রাসাদশিরে দণ্ডায়মান হইলেন—চারি চক্ষের মিলন হইল।

"উভয়েই কবি, অতএব প্রণয়ের মুখবন্ধ গদ্যে সুরু হইতে পারে না, পদ্যেই হইল। আকিল্ বলিলেন, 'প্রাসাদ-শিরে রক্তিম স্বপ্নপ্রতিমা প্রকাশ পাইল।' জেব্-উন্নিসা জবাব দিলেন, 'অনুনয়-বিনয়, জোর জবর্দস্তি, বা স্বর্ণমুদ্রা, কিছুতেই এ প্রতিমা লভ্য হইবার নহে।'

"লাহোরই জেব্-উন্নিসার মনের মত স্থান; এইস্থানে তিনি একটি উদ্যানও নির্ম্মাণ করাইতেছিলেন। একদিন নর্ম্মসখীগণের সহিত জেব্উদ্যানের একটি মর্ম্মরগৃহের নির্ম্মাণ-কার্য্য দেখিতে আসিলে, আকিল্ মজুরের বেশে মাথায় চুণ-সুরকীর

হাঁড়ি লইয়া হাজির! প্রেমিক-কবি উজীর-পুত্রের এই প্রেমভিক্ষার বেশ অতি অপূর্ব্ব সন্দেহ নাই; কিন্তু তিনি নিরুপায়। এই ছদ্মবেশ ধরিয়াই না কি তাঁহাকে প্রহরীর চক্ষে ধূলি দিয়া উদ্যানে প্রবেশ করিতে হইয়াছিল। বাদ্‌শাহ্‌জাদী তখন 'চৌসার' খেলায় মত্ত। আকিল্‌ নিকটবর্ত্তী হইয়া বলিলেন, 'তোমার আশায় আমি ধূলিকণার ন্যায় হইয়া সারা পৃথিবী ঘুরিয়া বেড়াইতেছি।' জেব্‌ বলিলেন, 'তুমি বায়ুর আকার ধারণ করিলেও আমার কেশাগ্র স্পর্শ করিতে পারিবে না।'

"আকিলের সহিত জেবের ঘন ঘন সাক্ষাৎ হইতে লাগিল। এ সকল কথা গোপনে থাকিবার নহে,—বিশ্বদূত জনরবের মারফৎ দিল্লীতে গিয়া আওরংজীবের কর্ণে উঠিল। বাদশাহ্‌ কালবিলম্ব না করিয়া লাহোরে পৌঁছিলেন; স্থির হইল, অবিলম্বে কন্যার বিবাহ দিয়া গোলযোগের অবসান করিবেন। কন্যা পিতাকে জানাইলেন যে, তিনি স্বয়ংবরা হইবেন; অতএব যাঁহারা তাঁহার পাণিপ্রার্থী তাঁহারা যেন তাঁহাদের প্রতিকৃতি পাঠাইয়া দেন। বলা বাহুল্য, জেব্‌ অতঃপর আকিল্‌কেই স্বামিত্বে বরণ করিবার সঙ্কল্প করেন। আওরংজীব তদনুসারে আকিল্‌কে ডাকিয়া পাঠান। কিন্তু জেব্‌-উন্নিসার এক ব্যর্থ প্রেমিক মধ্য হইতে বিভ্রাট্‌ ঘটাইল; সে আকিল্‌কে লিখিয়া জানাইল যে, 'সম্রাট্‌-কন্যার প্রণয়পাত্র হওয়া ছেলেখেলা

নহে। বাদ্‌শাহ্‌ সমস্ত ব্যাপার জানিতে পারিয়াছেন; দিল্লী পৌঁছিলেই, তুমি তোমার দারুণ পরিণাম বুঝিতে পারিবে।' পত্রপাঠে আকিলের এই ধারণা হইল যে, বাদ্‌শাহ্‌ নিশ্চয়ই তাঁহাকে কঠোর দণ্ডে দণ্ডিত করিবার মতলব করিয়াছেন। ইহাতে তাঁহার চিত্তে এতই আশঙ্কার সঞ্চার হইয়াছিল যে, তিনি বিবাহে অসম্মত হইয়া বাদ্‌শাহের নিকট পদত্যাগ-পত্র পাঠাইয়া দিলেন।

* * *

"কিন্তু হতভাগ্য আকিল্‌ খাঁ জেব্‌কে বিস্মৃত হইতে পারিলেন না; তাঁহাকে দেখিবার জন্য আবার গোপনে দিল্লীতে আসিয়া উপস্থিত। আবার উদ্যান-বাটিকায় উভয়ের সাক্ষাৎ! সংবাদ পাইয়া বাদ্‌শাহ্‌ অতর্কিতভাবে কন্যার নিকট উপস্থিত হইলেন। জেব্‌ পিতাকে আসিতে দেখিয়া প্রেমাস্পদকে অবিলম্বে একটি বৃহৎ ডেক্‌চীর মধ্যে লুকাইয়া রাখিলেন। কিন্তু চতুর-চূড়ামণি বাদ্‌শাহের চক্ষে ধূলি দেওয়া অসম্ভব; তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, 'এই ডেক্‌চীর মধ্যে কি?' জেব্‌ বলিলেন, 'গরম করিবার জল।' বাদ্‌শাহ্‌ হুকুম দিলেন, 'অগ্নিসংযোগে জল গরম কর।' তৎক্ষণাৎ বাদ্‌শাহের হুকুম তামিল করা হইল। জেব্‌ এই সময় স্বীয় প্রেমিকের জীবন অপেক্ষা আপনার যশোমানের জন্যই সমধিক ব্যাকুল হইয়াছিলেন। ডেক্‌চীর নিকট আসিয়া চুপি চুপি আকিল্‌কে বলিলেন,

'যদি সত্যসত্যই তুমি আমাকে ভালবাসিয়া থাক, তাহা হইলে মৌনী হইয়া আমার প্রাণ বাঁচাও।' আকিল্ খাঁ এইরূপে অনলে সিদ্ধ হইয়া তাঁহার প্রেমের পরীক্ষা দিলেন। জেব্-উন্নিসার একটি কবিতায় আছে,— 'প্রকৃত প্রেমের পরিণাম কি?' (উত্তর) 'জগতের তৃপ্তির জন্য আত্মবলিদান।' ইহার পর জেব্ সলীম্গড় দুর্গে বন্দী হন।"

বিবরণটি যে কতদূর বিশ্বাসযোগ্য, ইহার রচনাপ্রণালী দেখিলেই স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায়। তথাপি ইহার মূলে কোন ঐতিহাসিক সত্য নিহিত আছে কি না, বিচার করিয়া দেখা কর্ত্তব্য।

যাঁহারা মানুষী (i. 218) ও বার্ণিয়েরের (p. 13) ভ্রমণ-কাহিনী পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারাই জানেন যে, লেখকদ্বয় জেবের পিতৃষ্বসা জহান্-আরার অবৈধ-প্রেমের একটি বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। তাহাতে প্রকাশ, ডেকচীর মধ্যে লুক্কায়িত জহান্-আরার প্রণয়ীকে সিদ্ধ করিয়া হত্যা করা হয়। এই বিবরণের সহিত উর্দ্দূ-লেখকগণের অত্যাশ্চর্য্য মিল। প্রকৃত কথা, মানুষী ও বার্ণিয়ের-রচিত 'উদোর পিণ্ডী' উক্ত লেখকেরা 'বুদোর' ঘাড়ে চাপাইয়া নিশ্চিন্ত হইয়াছেন। লোক-মনোরঞ্জনের জন্য এই সকল লেখক রং-এর উপর রং ফলাইয়া ঐতিহাসিক সত্যের অপলাপ করিতে কিছুমাত্র কুণ্ঠিত হন নাই।

আকিল্ খাঁ অবশ্য ঐতিহাসিক ব্যক্তি; কিন্তু তাঁহার সম্বন্ধে ইতিহাস যাহা বলে, তাহা এই গল্পের সম্পূর্ণ বিরোধী। তাঁহার

পূর্ব্ব নাম, মীর অস্করী,—জন্মস্থান পারস্যের থাফ্; কিন্তু তিনি দিল্লীর কোন উজীরের পুত্র নহেন। সম্রাট্ শাহ্‌জহানের রাজত্বকালে আকিল্ কুমার আওরংজীবের অধীনে কর্ম্মগ্রহণ করেন। কুমার যখন দ্বিতীয়বার দাক্ষিণাত্যের শাসনকর্ত্তা (১৬৫২-৫৭), আকিল্ তখন তাঁহার 'জিলৌদার', অর্থাৎ অশ্বারোহী পার্শ্বচরের পদাভিষিক্ত। ইহার পূর্ব্বেই আকিলের কবিত্বের খ্যাতি হইয়াছিল; কবিতার ভণিতায় তিনি 'রাজী' নাম ব্যবহার করিতেন। দাক্ষিণাত্য ত্যাগ করিয়া সিংহাসন-অধিকারার্থ যুদ্ধাভিযানকালে আওরংজীব তাঁহার পরিবারবর্গকে দৌলতাবাদের দুর্গে রাখিয়া যান। ১৬৫৮ খ্রীষ্টাব্দের ৬ই ফেব্রুয়ারী হইতে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত প্রায় ১১ মাসকাল তাঁহারা ঐস্থানে অবস্থান করেন। আকিল্ খাঁ ৬ই ফেব্রুয়ারী হইতে আওরঙ্গাবাদের শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত হন, এবং ১৬৫৮ খ্রীষ্টাব্দের আগষ্ট হইতে ১৬৫৯ খ্রীষ্টাব্দের প্রায় শেষভাগ পর্য্যন্ত দৌলতাবাদ-দুর্গের রক্ষণাবেক্ষণের ভারপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ১৬৬০ খ্রীষ্টাব্দের ৮ই ফেব্রুয়ারী তিনি দিল্লীতে গমন করেন, এবং তাহার দুই মাস পরেই গঙ্গা ও যমুনার মধ্যবর্ত্তী প্রদেশ—মীয়ান্-দুয়াবের—ফৌজদার নিযুক্ত হন; ১৬৬১ খ্রীষ্টাব্দের জুলাই মাসে এই পদ অন্য এক ব্যক্তিকে দেওয়া হয়। পরবর্ত্তী নবেম্বর মাসে (১৬৬১ খ্রীঃ) শারীরিক অসুস্থতানিবন্ধন, আকিল্ খাঁ কিছুদিনের অবসরের জন্য দরখাস্ত করেন। এই ছুটি মঞ্জুর হইলে, তিনি মাসিক ৭৫০৲ টাকা বৃত্তি পাইয়া কিছুদিন লাহোরে অবস্থান করেন। আকিল্ খাঁর এই আবেদন-পত্রে (*Faiyyaz-ul-Qawanin*,

578) প্রকাশ তাঁহার বয়স তখন ৫০ বৎসরেরও বেশি।

কাশ্মীর হইতে প্রত্যাবর্ত্তনকালে আওরংজীব ১৬৬৩ খ্রীষ্টাব্দের নবেম্বর মাসে যখন সপরিবারে লাহোর অতিক্রম করিতেছিলেন, সেই সময়ে (২রা নবেম্বর) আকিল খাঁ রাজদর্শনে উপস্থিত হন; সম্রাট্ তাঁহাকে সঙ্গে আনিয়া দেওয়ান-ই-খাসের দারোঘার পদ প্রদান করেন (জানুয়ারী ১৬৬৪)। এই সময় আকিল্ খাঁ যে নিশ্চয়ই সম্রাটের খুব অনুগ্রহভাজন ছিলেন, তাহা স্পষ্টই বুঝা যায়; কারণ ১৬৬৬ খ্রীষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে তাঁহার পদোন্নতি হয়, এবং পর বৎসর মে মাসে তিনি সম্রাটের নিকট হইতে উপহার লাভ করেন। ইহার পরে আকিল্ খাঁ ডাকচৌকীর দারোঘার পদলাভ করিয়াছিলেন। ১৬৬৯ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে উক্ত পদ ত্যাগ করার পর সাত বৎসর, অর্থাৎ ১৬৭৬ খ্রীষ্টাব্দের অক্টোবর পর্য্যন্ত, তিনি কিরূপে কোথায় ছিলেন, তাহা আমাদের নিকট অজ্ঞাত। এই সময়ের পর হইতে আকিল্ খাঁ মাসিক ১০০০৲ টাকা বৃত্তি প্রাপ্ত হন এবং ১৬৭৯ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে তিনি 'দ্বিতীয় বখ্শী'র পদলাভ করেন। পরিশেষে ১৬৮০ খ্রীষ্টাব্দের অক্টোবর মাস হইতে ১৬৯৬ খ্রীষ্টাব্দে মৃত্যু পর্য্যন্ত, আকিল খাঁ দিল্লীর সুবাদারের পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। মৃত্যুর কিছু পূর্ব্বে তিনি এই পদ ত্যাগ করিতে চাহিলে, বাদ্শাহ্ উত্তরে তাঁহাকে যে স্নেহ-সূচক পত্র লেখেন, তাহা বিদ্যমান আছে। ইহাই আকিল খাঁর জীবনের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস।

তাহা হইলে আমরা নিঃসন্দেহরূপে জানিতে পারিতেছি যে, সম্রাটের আদেশে বুবা আকিল্ খাঁর পূর্ববর্ণিত মৃত্যু-কাহিনী সম্পূর্ণ মিথ্যা। আওরংজীবের সিংহাসন-অধিকারার্থ যুদ্ধগমনের পূর্ব্বে তাঁহার পরিবারবর্গ যে দুর্গে আশ্রয় লাভ করিয়াছিলেন, (৬ই ফেব্রুয়ারী হইতে ডিসেম্বর ১৬৫৮) তাহার রক্ষণাবেক্ষণের ভার অন্ততঃ ৩০ অপেক্ষা কমবয়স্ক কোন লোকের উপর অর্পিত হওয়া কথনই সম্ভবপর নহে। আর পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে, ১৬৬১ খ্রীষ্টাব্দে আকিল্ ছুটির জন্য যে আবেদন-পত্র প্রেরণ করেন, তাহাতে প্রকাশ, তৎকালে তাঁহার বয়ঃক্রম ৫০ বৎসরের ঊর্দ্ধ; সুতরাং ১৬৯৬ খ্রীষ্টাব্দে মৃত্যুকালে আকিল্ খাঁর বয়ঃক্রম যে ৮৫ বৎসরের অধিক হইয়াছিল, তাহা নিঃসন্দেহ।

এখন আকিল্ খাঁর জীবন-বিবরণ হইতে দেখা যাউক, কোন্ কোন্ সময়ে তিনি ও জেব্-উন্নিসা একই স্থানে অবস্থান করিয়াছিলেন—

(১) ১৬৫৮ খ্রীষ্টাব্দে দৌলতাবাদে মাস-দশেকের জন্য।

(২) ১৬৬৩ খ্রীষ্টাব্দে লাহোরে এক সপ্তাহের জন্য।

(৩) ইহার পর হইতে ১৬৬৯ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে পদত্যাগ পর্য্যন্ত সময় দিল্লী ও আগ্রার রাজদরবারে।

(৪) ১৬৮০ খ্রীষ্টাব্দের ৬ই মে জেব্-উন্নিসা দিল্লী হইতে আজ্‌মীরে পৌঁছেন। ইহার অনেক পূর্ব্বেই মারওয়াড় ও মিবারের সহিত যুদ্ধহেতু বাদ্‌শাহ্ আকিল্ খাঁ-সহ আজ্‌মীরে আগমন করেন; কাজেই ১৬৮০ খ্রীষ্টাব্দের মে মাস হইতে ১৬৮১ খ্রীষ্টাব্দের

জানুয়ারী মাসে বন্দী হওয়া পর্যান্ত প্রায় ৮ মাস কাল আকিল্ খাঁ ও জেব্-উন্নিসা একই স্থানে অবস্থান করিয়াছিলেন।

(৫) ১৬৮১ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী হইতে ১৬৯৬ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত দিল্লীতে।

এখন দেখা যাইতেছে যে, যদি বাদ্শাহের অনুপস্থিতিতে আকিল্ খাঁ ও জেবের মিলন-সংঘটন ও প্রেমালাপ হইয়া থাকে, তবে তাহা প্রথম ও শেষোক্ত সময়ের অবকাশে ঘটিয়াছিল; কারণ এই সময়ে বাদ্শাহ্ অন্যত্র ছিলেন।

আকিল খাঁর রাজকার্য্য হইতে অল্পদিনের জন্য অবসর-গ্রহণ এবং লাহোরে অবস্থান (নবেম্বর ১৬৬১ হইতে অক্টোবর ১৬৬৩) সম্রাটের নিগ্রহের চিহ্ন হইতে পারে না; কারণ অবসরপ্রাপ্তি-কালে আকিল্ খাঁ নিয়মিতরূপে বাদ্শাহের নিকট হইতে উপযুক্ত বৃত্তিলাভ করিয়াছিলেন; তবে রাজধানী ও সম্রাটের পারিষদ্বর্গ হইতে সুদীর্ঘ ১০ বৎসরকাল (১৬৬৯—১৬৭৯) দূরে অবস্থান, এবং এই দশ বৎসরের মধ্যে বিশেষতঃ প্রথম যে সাত বৎসর সম্রাটের কোনরূপ অনুগ্রহলাভে বঞ্চিত হ'ন, তাহা হইতে স্পষ্টই বুঝা যায় যে, কোন অজ্ঞাত কারণবশতঃ এই সময়ে তিনি বাদ্শাহের বিরাগভাজন হইয়াছিলেন।

তবে কি ইহা জেব্-উন্নিসার সহিত অবৈধ প্রেমালাপের শাস্তি? ১৬৮০ খ্রীষ্টাব্দে, অর্থাৎ বিদ্রোহী হইবার অনতিপূর্ব্বে, কুমার আক্বর ভগিনী জেব্‌কে এই মর্ম্মে একখানি পত্র লিখিয়াছিলেন— "সম্রাট্ এক্ষণে আদেশ প্রচার করিয়াছেন যে, আকিলের মোহরযুক্ত

কোন পুলিন্দা প্রাসাদস্থ ললনাগণের কক্ষে লইয়া যাওয়া একেবারে নিষিদ্ধ ; কাজেই ইহা সুনিশ্চিত যে, এক্ষণে [আমাকে ?] কাগজপত্র বিশেষ বিবেচনা করিয়া পাঠাইতে হইবে।"

এই আকিল্‌ই কি তবে জেব্‌-উন্নিসার প্রণয়াস্পদ কবি—আকিল্ খাঁ রাজী ? না,—আমাদের মনে হয়, তাহা নহে। এই সময়ে কুমার আক্‌বরের শিবিরে মুহম্মদ আকিল্ নামে একজন মুল্লা অবস্থান করিতেন। ইনিই পরে আক্‌বরের স্বপক্ষে, আওরংজীবকে সিংহাসনচ্যুত করিবার জন্য ব্যবস্থা ('ফতাওয়া') দিয়াছিলেন এবং তাহার ফলে, আক্‌বরের পরাজয়ের পর বাদ্‌শাহ্‌ কর্ত্তৃক কারাবদ্ধ হন ও প্রহারলাভ করেন। জেব্‌-উন্নিসা ধর্ম্মগ্রন্থ কোরাণে বিশেষভাবে ব্যুৎপন্ন ছিলেন ; তাঁহারই পৃষ্ঠপোষকতায় মুসলমান-ধর্ম্মগ্রন্থের কয়েকখানি ভাষ্য রচিত হইয়াছিল ; কাজেই তাঁহার সহিত মুল্লা মুহম্মদ্ আকিলের ন্যায় একজন বিখ্যাত ধর্ম্মতত্ত্বালোচনাকারীর পত্র-ব্যবহার যে কেহ সন্দেহের চক্ষে দেখিত না, তাহা স্বাভাবিক। কুমার আক্‌বরের পত্রের মর্ম্ম এই যে, তাঁহার নিজের মোহরযুক্ত পুলিন্দা পাঠাইলে পাছে শত্রুহস্তে পতিত হয়, এই কারণে তিনি ভগিনী জেব্‌-উন্নিসাকে যে-সমস্ত গোপনীয় পত্র লিখিতেন, তাহা আকিলের পত্রের মধ্য দিয়া প্রেরিত হইত ; কেন না, তাহা বিনা বাধাবিঘ্নে জেবের নিকট পৌঁছিত। পত্রখানির শেষাংশ হইতে এ কথা আরও পরিস্ফুট হইবে—

"তোমাকে পত্র লিখিতে বিলম্ব হওয়ার একমাত্র কারণ, ভয় হয়, পাছে আমার পত্র অন্য লোকের [অপরিচিত লোক, অর্থাৎ শত্রুর] হস্তে পতিত হয়।"

যদি কেহ বলিতে চাহেন, কন্যার সহিত কবি আকিল খাঁ রাজীর প্রণয়-ব্যাপারের সন্ধান পাইয়া বাদ্‌শাহ্‌ উভয়ের মধ্যে পত্র-ব্যবহার বন্ধ করিয়া দেন, তাহা হইলে, তাহা একেবারে অযৌক্তিক হইবে; কারণ, ইহার কয়েক মাস পরেই আকিল্‌ খাঁ বিশেষ দায়িত্বপূর্ণ দিল্লীর শাসনকর্ত্তার পদলাভ করিয়াছিলেন—এবং পর বৎসরের প্রারম্ভে জেব্‌ বন্দী হইয়া দিল্লীতেই প্রেরিতা হন।

জেব্‌-উন্নিসা পিতার আদেশে ১৬৮১ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে বন্দী হন। সরকারী ইতিহাসে অতি স্পষ্টই উল্লিখিত হইয়াছে যে, ভ্রাতা আক্‌বরের বিদ্রোহ-ব্যাপারে লিপ্ত থাকাই তাঁহার বন্দীত্বের একমাত্র কারণ।

জেব্‌-উন্নিসার এই কঠোর কারাবাসকালে যদি কেহ তাঁহাকে ও আকিল্‌ খাঁকে লইয়া মনে মনে একটি প্রেম-কাব্য রচনা করিতে চাহেন, তাহা হইলে তাহাও কতদূর স্বাভাবিক হইবে, বলা যায় না; কারণ জেব্‌-উন্নিসা তখন ৪৩ বৎসর বয়স্কা প্রৌঢ়া রমণী, এবং আকিল্‌ খাঁ ৭২ বৎসরের বৃদ্ধ।

ইহার পর আরও একটা ভিত্তিহীন জনরব আছে। এই অমূলক জনপ্রবাদের সৃষ্টি মহারাষ্ট্রবীর ছত্রপতি শিবাজীকে লইয়া। প্রকাশ যে, ১৬৬৬ খ্রীষ্টাব্দের ১২ই মে শিবাজী যখন বাদ্‌শাহের

সহিত সাক্ষাৎ করিতে আগ্রায় আসেন, সেই সময়ে জেব্ প্রথম দর্শনেই শিবাজীকে মনঃপ্রাণ অর্পণ করিয়াছিলেন। প্রণয়িযুগল কেমন করিয়া পরস্পর অঙ্গুরী-বিনিময় করিয়া বিদায়গ্রহণ করিয়াছিলেন, ৫০ বৎসর পূর্ব্বে ৺ভূদেব মুখোপাধ্যায়ও 'অঙ্গুরীয় বিনিময়' উপন্যাসে তাহা বর্ণনা করেন। কিন্তু তাহা ঐতিহাসিক তত্ত্ব নহে;—গল্প! সমসাময়িক কোন ফার্সী ইতিহাস দূরে থাকুক, মারাঠী ভাষায় লিখিত শিবাজীর কোন জীবনচরিতও এ কথা সমর্থন করে না যে, একজন বাদশাহ্‌জাদী পিতৃরাজধানীতে বন্দী শিবাজীর দুর্ভাগ্যের জন্য সমবেদনা প্রকাশ করিয়াছিলেন। অন্য কোন কারণেও না হউক, একমাত্র জেব্-উন্নিসার সুশিক্ষা, সুরুচি ও সৌন্দর্য্যবোধই যে তাঁহাকে শিবাজীর ন্যায় অশিক্ষিত, অভব্য, দক্ষিণী হিন্দুর সহিত প্রেম-বিনিময়ে বিরত করিত,—ইহা স্বাভাবিক; সুতরাং এই কাহিনীটি কেবল অনৈতিহাসিক নহে, পরন্তু অস্বাভাবিক।

প্রমাণ-পঞ্জী

গুল্‌বদন্ ঃ-

Humayun-nama by Gulbadan Begam trans. by A. S. Beveridge, (Oriental Trans. Fund), 1902.

'গুল্‌বদন্' প্রবন্ধটি প্রধানতঃ বেভারিজ-পত্নীর Introduction (pp. 1-79) অবলম্বনে লিখিত।

Akbarnama by Abul-Fazl 'Allami—trans. by H. Beveridge, I. C. S. (Bibliotheca Indica), vol. III.

Muntakhab-ul-Tawarikh—Abdul Kadir Al Badauni, trans. by W. H. Lowe, vol. II.

Humayun-nama by Bayazid Biyat as trans. by H. Beveridge in *J. A. S. B.*, 1898.

চিত্র ঃ—কলিকাতার ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালে গুল্‌বদন বেগমের একখানি রঙীন্ চিত্র (No. 1060) আছে।

জেব্-উন্নিসা ঃ—

History of Aurangzib, (2nd ed.)—Prof. Jadunath Sarkar, M.A., i. 60-61; iii. 53-54, 365.

Studies in Mughal India, Prof. Jadunath Sarkar, M.A., pp. 79-90.

'জেব্-উন্নিসা কি কলঙ্কিনী ?' অধ্যায়টি এই পুস্তকে প্রদত্ত Zeb-un-nisa প্রবন্ধের অংশ-বিশেষের সারসঙ্কলন।

Bankipur Oriental Public Library Catalogue of MSS. 'Persian Poetry' by Khan Sahib Abdul Muqtadir, iii. 250-1.

'দিউয়ান্-ই-মখ্‌ফী কি জেব্-উন্নিসার ?' অধ্যায়টি খাঁ সাহিবের রচনা-অবলম্বনে লিখিত ; তিনি দিউয়ানের বিস্তৃত সমালোচন ও পরীক্ষা করিয়াছেন।

Beale's *Oriental Biographical Dictionary*, ed. by Keene, p. 428.

চিত্র ঃ—দিল্লী মিউজিয়মে জেব্-উন্নিসার দুইখানি (H. 70 & H. 187) রঙীন চিত্র আছে। ইহার শেষোক্তখানি এই পুস্তকে প্রদত্ত হইয়াছে।

শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের গ্রন্থাবলী

বেগম সমরু—(২য় সংস্করণ)

এই প্রাচ্য-মহিলার অমানুষী প্রতিভা, অসামান্য প্রভুত্ব, অপরিমেয় দানশীলতা, সর্ব্বোপরি রণস্থলে তাঁহার শৌর্য্য-বীর্য্যের কথা পাঠ করিলে বিস্ময়ের উদ্রেক করে। ৮ খানি সুন্দর হাফ্‌টোন চিত্র শোভিত। মূল্য ॥০

বাঙ্গলার বেগম—(২য় সংস্করণ)

অধ্যাপক শ্রীযুক্ত যদুনাথ সরকার, এম-এ, আই-ই-এস্, লিখিত ভূমিকা-সম্বলিত। অনেকগুলি হাফটোন চিত্র সুশোভিত। মূল্য ॥০ আট আনা।

মোগল-যুগে স্ত্রীশিক্ষা—

অধ্যাপক শ্রীযদুনাথ সরকার লিখিত পাণ্ডিত্যপূর্ণ ভূমিকা। সুন্দর রঙ্গীন্ প্রচ্ছদপট এবং বহু চিত্র সুশোভিত।

মোগল বাদশাহ্‌জাদীগণের সুশিক্ষা, সাহিত্য-প্রতিভা, সুরুচি প্রভৃতির পরিচয় এই গ্রন্থে প্রদত্ত হইয়াছে। মূল্য দশ আনা

দিল্লীশ্বরী—

সম্রাজ্ঞী রাজিয়া ও 'জগজ্জ্যোতিঃ' নূরজহানের অপূর্ব্ব জীবন-কথা অতি সরস করিয়া লিখিত। রাজিয়া ও নূরজহানের দুইখানি সুদৃশ্য প্রাচীন চিত্রও পুস্তকে স্থান পাইয়াছে। মূল্য ॥০

জহান্-আরা—দ্বিতীয় সংস্করণ শীঘ্রই মুদ্রিত হইবে।

প্রাইজ ও লাইব্রেরীর জন্য অনুমোদিত ছোট ছেলেমেয়েদের জন্য লেখা তিনখানি মজাদার ইতিহাসের গল্পের বই :—

রাজা-বাদশা	মূল্য ৷৵০
রণ-ডঙ্কা	" ৷৵০
কেল্লা-ফতে	" ॥০